182. Od. 886, 7. 4.

অশোকা।

(উপন্যাস।)

শ্রীমতী "বনলতা" "নীহারিকা" ও
"আর্য্যাবর্ত্ত" রচয়িত্রী কর্ত্তৃক
প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।

বনার্জ্জি এণ্ড কোম্পানীর কহিনুর যন্ত্রে
শ্রীমহেন্দ্রনাথ পাত্র দ্বারা মুদ্রিত
ও প্রকাশিত।

—:০:—

১২৯৬ সাল।

উপহার।

সুহৃদবাবু!

সন্ধ্যা হ'তে এক মনে
জননীর সন্নিধানে
নিবিবিলি ভাই দু'টী
বসে থাক, হলে ছুটী,
উপকথা, উপন্যাস, শুনিবাব তবে,
রাজা, বাজপুত্র কথা,
একই মরমে গাঁথা,
কতবার শুনো, তবু তৃপ্তি নহে মন,
"অশোকা" তোমার তাই
ভাল লাগিবেরে ভাই,
এ কাহিনী-উপহাব-স্নেহ-নিদর্শন,
শোণিতে শোণিতে চির "রাখির" বন্ধন।

অশোকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মাতা কন্যা।

মথুরার বলরাম ঘাটের অনতিদূরে একটী ক্ষুদ্র কুটীরে বিধবা তারাদেবী বালিকা কন্যা সহ বাস করেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কুটীর, বৈভবের চিহ্নহীন হইয়াও দারিদ্র্য অন্ধকারে মলিনতা প্রাপ্ত হয় নাই। দিব্য পরিপাটী সব, বিধবা অতি গরিব, কিন্তু সম্ভ্রান্ত বংশজাত ; পূর্ব্ব পরিচ্ছন্নতা এইক্ষণেও সকল বিষয়েই রাখিয়াছেন। কুটীরের সম্মুখ-প্রাঙ্গণে ছোট খাট একটী পুষ্পোদ্যান এবং তাহার অন্যদিকে আবার একটী শাক সবজির বাগান আছে। এই সমুদায় তাঁহাদিগের স্বহস্তজাত হইয়া আরো অধিকতর রমণীয় হইয়াছে। প্রাতঃ-সন্ধ্যায় তাঁহারাই তাহাতে জল সেচন করিতেন।

বিধবার কন্যামাত্র সম্বল, তাহাকেই আশ্রয় ও অবলম্বন করিয়া তারাদেবী কোনরূপে বৈধব্যশোক ভুলিবার চেষ্টা করিতেন। যথার্থ হিন্দুবিধবার পতিহীন জীবনে এ সংসারে পার্থিব কিছুই আর

প্রয়োজন করে না। ব্রতাচারে কেবল মাত্র জীবনের অবশিষ্ট কাল একবার সামান্য আহারে অতিবাহিত করেন। ত্যাগ স্বীকারের জীবন্ত প্রতিমা বিধবা নারী, হিন্দুর ঘরে ঘরে অদ্যাপি শান্তিরূপে বিরাজিতা রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের কথা আর নূতন করিয়া কি বলিব, নিঃস্বার্থ পরোপকারে অনাথা তারাদেবী প্রতিবাসীগণের নিকট পূজনীয়া হইয়া সম্মান সহকারে এই সুদূর প্রবাসেও যথার্থ আত্মীয় বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন।

সায়াহ্নকাল সমাগত দেখিয়া তারাদেবী ফুল গাছে বারিসিঞ্চন করিবার জন্য কন্যাকে ডাকিলেন। ক্ষুদ্র বালিকা অশোকা বাল্য-স্বভাব সুলভ চঞ্চলতা সহ সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ তুলিয়া ছুটীতে ছুটীতে মাতার নিকট আসিয়া তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া হাসিতে লাগিল। তারাদেবী সাদরে সস্নেহে বালিকার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন—

"যা, মা, বইখানি রাখিয়া আয়্। আর পড়া ভাল না। সমস্ত দিন ঘরে বসিয়া পড়্লে অসুখ করবে যে। ফুলগাছে জল দিবার সময় হইয়াছে, আয় আমরা জল দেই। তোর যে দুর্ব্বল শরীর, অত পড়লে গুরুদেব রাগ করিয়া আমাকেই বকিবেন, তা বুঝি মনে নাই, অশোকা মার কথায় আরো হাসিতে লাগিল ও বলিল "ঠাকুরজী এখন কোথায় মা, হাঁ মা, তিনিত অনেক দিন আসেন নাই, কবে আস্বেন বলনা মা।"

তারাদেবী কন্যার সেই হাস্যময় মুখের দিকে চাহিয়া, চাহিয়া, অন্য সব যেন বিস্মৃত হইয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় তাঁহারা যখন পুষ্পবৃক্ষে বারি সিঞ্চন করিয়া

সেখানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন তখন তারাদেবীর পরিচারিকা যশোদা একখানি ক্ষুদ্র পত্র আনিয়া তাঁহাকে দিল। তিনি সেই পত্রখানি পড়িবার নিমিত্ত কুটীরে গিয়া প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহা পড়িতে লাগিলেন। অশোকা ধীরে ধীরে জননীর পার্শ্বে আসিয়া বসিল, পত্র খানি এইরূপ,—

"মা তারা

আমি এইক্ষণে কাশীধামে আছি। বিশেষ কোন কার্য্য গতিকে শীঘ্রই আমার মিরাট যাওয়ার প্রয়োজন আছে, ফিরিবার সময় তোমাদিগকে দেখিয়া আসিব, আপাততঃ কার্য্যসিদ্ধ হইবার আশা নাই, ভগবান্ যদি দিন দেন তবে একদিন এই দীন ব্রাহ্মণের অভিলাষ পূর্ণ হইবে। তুমি ভাবিওনা, যাহা আবশ্যক "মঠ" হইতে লইবে ও সেখানে আমার ঠিকানা জানিতে পারিবে, আমার আশীর্ব্বাদ মাতা কন্যায় গ্রহণ কর। আমার কায়িক কুশল।

চির আশীর্ব্বাদক আচার্য্য।"

ঠাকুরজী শীঘ্র আসিতে পারেন শুনিয়া অশোকা অতিশয় আনন্দিত হইয়া মাতাকে আবার কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া টানিতে লাগিল; ওদিকে সন্ধ্যাসমাগমে শান্তিময় মথুরার চতুর্দ্দিকে আরতির শাঁক ঘণ্টা কাঁসর রবে দলে দলে নরনারী আবাল বৃদ্ধ মথুরানাথ দর্শনার্থ সেই দিকে ছুটিতে লাগিল। তীর্থ স্থানের মহিমা হিন্দু ভিন্ন কে অনুভব করিতে পারে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বালক বালিকা।

পর্ব্বদিন, রাজপথ যমুনার-ঘাট এবং দেবালয় প্রাঙ্গণ লোকাকীর্ণ। বাঙ্গালী যাত্রীর কোলাহলে মথুরার ঘুমন্ত প্রাণে কেমন একটা কলরব উত্থিত করিয়াছে এবং সেই ধ্বনি বায়ু সঙ্গে মিশিয়া চারিদিকে প্রতিধ্বনিত করিয়া যেন নির্জ্জনতার শান্তিভঙ্গ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। বেলা প্রায় যায় যায়, সমস্ত দিন পরে বৈষ্ণব যাত্রীর দল একটু বিশ্রাম মানসে ছায়াময় বৃহৎ আম্রকাননে আহারাদি করিবার জন্য সকলে একত্র হইয়াছে। এই জনরবের সুদূরে নির্জ্জন ঘাটের উপর রাজপুত বালক অরণ্যকমল উপবেশন করিয়া যমুনাবক্ষে অস্তগামী সান্ধ্য শোভা দেখিতেছিল। তাহার পার্শ্বে অশোকা নীরবে বসিয়া অনন্যমনে সুন্দর আরক্তলোচন তাহারই মুখপানে তুলিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া কত কি ভাবিতেছিল। মৃদু মন্দ বায়ু-হিল্লোলে কুঞ্চিত কেশকলাপ এক একবার কমনীয় বদনমণ্ডল আবৃত করিয়া আবার, যমুনা প্রাণে মিশিয়া যাইতেছিল। সেই আবৃত মুখকমল নিরীক্ষণ করিতে বালক চূর্ণিত কেশগুলি সযত্নে সরাইয়া তাহার সেই শৈশব মাধুরী অনুভব করিতেছিল। উভয়েই নীরব, অধিকাংশ সময় বলিবার শত কথা থাকিতেও আমরা তাহা ভাষায় প্রকাশ

করিতে পারি না, বাক্যে মনের ভাব প্রকাশিত হয় না, কেবল নয়নের পূর্ণ দৃষ্টিতে একাগ্রতা, প্রাণের আবেগ প্রকাশিত হয়। এ সংসারে বালক বালিকার প্রেমে যে শোভা আছে, তাহা কয় জন অনুভব করে, শৈশব প্রেমের স্মৃতি জীবনের শেষভাগেও কেমন একটা শান্তি ঢালিয়া দেয়।

কতক্ষণ নিস্তব্ধতার পর বালিকা ডাকিল "অরুণ" সে বলিল "কেন" .অশোকা, "কৈ, অরুণ তুমিত আমায় ইংরাজী গল্প পড়িয়া এ কয় দিন শুনাও না? তোমার কাছে এখন পড়া না দিলে বুঝিতে পারি না কত খানি শিখ্‌লাম, তুমি খুব ভাল করিয়া সব বল কি না। যার নিকট পড়্‌লে যেমন ভাল লাগে, তোমার কাছে তার চেয়েও ভাল লাগে। তুমি স্কুল কলেজে পড়, তাই তোমার কত জানা শুনা আছে"। অরণ্য, "তা আমারো এখন ছুটী আছে, তোমায় রোজই পড়াইতে পারি। তোমাকে ইংরাজী পড়াইতে আমার ভাল লাগে। তুমি পড়্‌বে কি অশোক! অশোকা, ঠাকুরজী শীঘ্র আসিবেন। তাঁহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া মা কোন কাজ করেন না, তাঁর মত হইলেই আমি ইংরাজী পড়্‌ব। তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা কর না কেন, এবার তিনি আসিলে তুমি এসো। কত ভাল ভাল গল্প শুনিবে, তিনি কত দেশ বেড়ান।" অরণ্য, "আচ্ছা" বলিয়া, বালিকার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বাড়ী যাইবার জন্য দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যমুনার নীল তরঙ্গে সন্ধ্যা স্তিমিত কিরণবাজি দেখিতে দেখিতে অন্য মনে দুই জনে আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল। গৃহগমনে বিলম্ব দেখিয়া যশোদা যখন তাহাদিগকে ডাকিতে আসিল, তখন দিব্য রাত্রি হইয়া গিয়াছে।

অরণ্যকমল একজন সম্পদশালী রাজপুতের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। তাহার পিতা উদয় প্রতাপ সিংহ বিশেষ কোন ঘটনা বশতঃ জন্ম ভূমি রাজস্থান ছাড়িয়া বহুকাল মথুরাবাসী হইয়াছিলেন। সেখানে তিনি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি মধ্যে পরিগণিত হইয়া নিরুদ্বেগে জীবন অতিবাহিত করিতেন, তাঁহার আরো কয়েকটী পুত্র কন্যা ছিল এবং সকলের ছোট বলিয়া অরণ্যকমল জনক জননীর এত আদরের সন্তান এবং সে যাহা বলিত তাঁহারা তাহাই করিতেন।

আশৈশব বাঙ্গালীদিগের সহবাসে ও স্কুলে লেখা পড়া করায় অরণ্যকমল পরিষ্কারভাবে বাঙ্গালা শিখিয়াছিল ও বলিতে পারিত। তাহার পরিবারগণও তাহা বলিতে এবং বুঝিতে পারিতেন। ইংরাজী অধ্যয়নে অরণ্যকমলের আচার ব্যবহার অনেকটা প্রায় বাঙ্গালীর ন্যায় হইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিলে সহসা রাজপুত বলিয়া কেহ চিনিতে পারিত না, তাহারাই অশোকার মাতার অতি নিকট প্রতিবাসী এবং উভয় পরিবারে বিলক্ষণ সদ্ভাব থাকায় তারাদেবী অরণ্যকমলকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। অশোকার সহিত আলাপে তাহা আরো ঘনীভূত হইয়াছিল।

বাল্য স্নেহের চিহ্ন স্বরূপ অরণ্যকমল ফুলটী ফলটী যেখানে যাহা পাইত আদরে আনিয়া অশোকাকে উপহার দিত। বালিকা সরল, স্নেহের পূর্ণ প্রতিদানে তাহার কৈশোর জীবন বড় সুখময় ছিল। অশোকা তখন ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা, অরণ্যকমল কিশোর বয়স্ক যুবক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জীবারাম গোস্বামী।

প্রভাতরশ্মি প্রকৃতির ঘুমন্ত মুখে একটু আধটু করিয়া পড়িতেছে। সেই মৃদু মধুর উষালোকে কলকণ্ঠ বৈতালিক বিহঙ্গের ললিত সঙ্গীত তানে এবং প্রাতঃস্নানগামী সন্ন্যাসী-ব্রাহ্মণদিগের অপূর্ব্ব স্তুতি পাঠ ধ্বনিতে চতুর্দ্দিকে কেমন একটা অভিনব পবিত্র ভাব ধারণ করিয়াছে। রাজপথে কেবলমাত্র দুই একটী লোক দেখা দিয়াছে। তখনও নির্জ্জনতা দূর হয় নাই। এই পুণ্যময় রমণীয় প্রদেশ আরো পবিত্র করিয়া একজন প্রৌঢ় সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে বলরাম ঘাটের নিকটবর্ত্তী কুটীরাভিমুখে যাইতেছিলেন। গৈরিক বস্ত্র পরিহিত উষ্ণিষধারী সন্ন্যাসী ঠাকুরের পদে খড়ম ও হস্তে তালপত্রের ছত্র এবং কতকগুলি পুঁথি ছিল, অন্য মনে কি ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিলেন, কোন দিকে লক্ষ্য নাই—রাজপথে দু' একজন তাঁহাকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইল। তিনি কাহারো সঙ্গে কথা কহিলেন না, কিন্তু আশীর্ব্বাদ স্বরূপ হস্ত উর্দ্ধদিকে প্রসারণ করিলেন। তাঁহার সুগঠিত দীর্ঘবপুঃ, উজ্জ্বল-চক্ষু, প্রশস্ত ললাট বিভূতি রেখা রঞ্জিত এবং মণ্ডিত মস্তক, শ্মশ্রু বিহীন গম্ভীর শান্ত মুখ মণ্ডল, চিন্তার বিলাসভূমি কেমন স্বর্গীয় ভাবে দীপ্তি পাইতেছিল। তিনি

পশ্চিমের অধিকাংশ ধনী দরিদ্রের নিকট পরিচিত ও গুরুবৎ পূজনীয় ছিলেন, বড় বড় মঠধারী পরমহংস এবং শাস্ত্রজ্ঞ সন্ন্যাসীগণ সকলেই তাঁহাকে জানিতেন। তিনি সমস্ত বৎসর তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া সময় সময় দুই একবার মথুরায় আসিতেন। কখন তাঁহার গুরু শঙ্করানন্দ পরমহংস স্বামীর মঠে অবস্থিতি করিতেন, কখন বা প্রিয় শিষ্যা তারাদেবীর কুটীরে থাকিতেন।

শঙ্করানন্দ স্বামীকে অনেকেই যোগসিদ্ধ পুরুষ বলিয়া দেবতার মত পূজা করিত। কিন্তু তিনি অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞ এবং জ্ঞানী হইয়াও মৌনব্রতে যোগ সাধনে নিমগ্ন থাকিয়া, পরমার্থ চিন্তায় ইহ জগৎ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে, জীবারাম গোস্বামী মঠে আসিলে গভীর নিশীথকালে কেবল তাঁহার সহিত শাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্বাদি আলোচনা ও মীমাংসা করিতেন। জীবারাম গোস্বামী তাঁহার নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপূত হন।

জীবারাম ঠাকুর ভস্মাবৃত সন্ন্যাসী নহেন। তিনি এক অলৌকিক সন্ন্যাসী এবং পৌত্তলিকতা হীন, একেশ্বর বাদী। নিষ্কাম ধর্ম্ম ও স্বদেশ প্রেমে জীবন উৎসর্গ করিয়া তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে ও অধ্যয়ন অধ্যাপনায় সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন, অসংখ্য দীন দুঃখী প্রজার দুর্গতি বিমোচন এবং ভারতের লুপ্ত সৌভাগ্য পুনরুদ্ধার করিতে কি কষ্ট না স্বীকার করিতেন। শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে কাটিয়া যাইত শারীরিক ক্লেশ কিছুতেই অনুভব করিতেন না। দীনের কুটীর আর রাজপ্রাসাদ তাঁহার নিকট সমান ছিল। বহুসংখ্যক রাজপুত ও ক্ষত্রিয় সিপাইগণ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহারই আজ্ঞানুসারে জীবন নিয়োজিত করিয়াছিল।

জীবারাম গোস্বামী মৃদুমন্দ গমনে তারাদেবীর কুটীর দ্বারে গিয়া "মাগো আমি আসিয়াছি" বলিয়া আঘাত করিলেন। তারাদেবী তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি দ্বার মুক্ত করিয়া গললগ্ন কৃতবাসে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চরণধূলি মস্তকে লইলেন। প্রফুল্ল অশোক কুসুমটীও ঠাকুরজীকে প্রণাম করিয়া বসিতে কুশাসন পাতিয়া দিল।

তারা, "আপনি যে আজই দর্শন দিবেন তাহা আমি মনে করি নাই। অদ্য অসময়ে গুরুদেবের পদার্পণে আমার সকল ভাবনা দূর হইল। কতকাল আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই। কার্য্যসিদ্ধির কি করিতে পারিলেন তাও জানিতে পারি নাই, বলুন সব। আপনাকে সেই হইতে প্রতিদিনই প্রতীক্ষা করিতাম।"

সন্ন্যাসী,—"মা তারা, আমার আর আজকাল মোটে অবসর নাই। কবে কোথায় থাকি তাহার ঠিক না থাকায় আমি তোমাকে নিয়মমত পত্র লিখিতে পারি না। তবে আমার শত কাজের মধ্যেও তোমার ভাবনা। মায়াময় এই ব্রহ্মাণ্ড-মায়াতে জীবকুল মুগ্ধ। আমিও তোমাদিগের মায়ায় কোন খানে স্থির হইতে পারি না মা।"

তারা,—"গুরুদেব, আপনি ভিন্ন আর জগতে আমার কে আছে বলুন?"

সন্ন্যাসী খানিক নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন "মায়া, মায়া, মোহময় মায়া কাটাইব এমন কি পুণ্য করিয়াছি?"

তারাদেবী সন্ন্যাসী ঠাকুরের হৃদয়তত্ত্ব জানিতেন, সেই জন্য তাঁহাকে অন্যমন করিতে অশোকার কথা তুলিলেন।

তারা;—"আমাকে আপনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন তা মঠ হইতে আনিয়াছি। টাকাও পাইয়াছি। হাঁ, এক কথা, অশোকা অরণ্যকমলের নিকট ইংরাজী পড়্তে চায়, তাহাতে আপনার মত কি জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছে।"

তাহা শ্রবণ করিয়া জীবারাম গোস্বামী অশোকার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া কহিলেন, "অশোকা তোমার ব্যাকরণ কতদূর পড়া হইয়াছে? "মহাভারত ও রামায়ণ" নিয়মমত পড়ত? মহারাজা ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির যেমন যুদ্ধবিমুখ, তাঁহার পত্নী দ্রৌপদী দেবী আবার তেমনি ন্যায় যুদ্ধের পক্ষপাতিনী, কাজেই উভয়-চরিত্র সামঞ্জস্য হীন। একদিকে যেমন শ্রীকৃষ্ণ, অন্যদিকে তেমনি দ্রৌপদী। কবির শিল্প-নৈপুণ্য চমৎকার। সংস্কৃত ভাষা দেবতার ভাষা তাহা আগে আয়ত্ত কর, দেব চরিত্র আলোচনায় মানসিক শিক্ষা পূর্ণ হউক, তখন ইংরাজী পড়িও। তোমাকে গীতা পড়াইতে মঠের শিষ্য কেহ আইসেন কি? আমি ত বলিয়া দিয়াছি। তোমার যদি নিতান্তই ইচ্ছা হয়, তবে এক আধটু ইংরাজী না হয় পড়িও।"

অশোকা বলিল "হাঁ, আমার ইংরাজী পড়িতে যদি আপনার আপত্তি না থাকে তাহা হইলে অরণ্যকমল পড়াইতে চান এখন তাঁর ছুটী আছে।" জীবারাম সন্ন্যাসী কিছু গম্ভীর হইলেন, আবার এখন সংস্কৃত পবিত্র দেব ভাষা ভিন্ন বিশ্ব সংসারে আর কিছু তিনি পাঠোপযোগী মনে করেন না। তাহার উপর তাঁহার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা যে প্রকার বিচলিত তাহাতে হিন্দু, বালিকার বিজাতীয় ভাষা শিক্ষার উপকারিতা চিন্তা করিতেও

তিনি অসমর্থ।. তথাপি মার্জ্জিত উচ্চ শিক্ষার গুণে ও অসাধারণ উদারতার জন্য মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার চিন্তার গতি অন্য দিকে ফিরাইলেন। তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, কাব্য, ইতিহাসের অমর সৌন্দর্য্য হৃদয়ে অনুভব করিতে করিতে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। নিরপেক্ষ ভাবে তাহার অজস্র প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার গত জীবনের স্মৃতি ঘনীভূত ইংরাজী সাহিত্য বিজড়িত।

তাহার পর অশোকা দৈনিক অধ্যয়ন জন্য স্থানান্তরে উঠিয়া গেল.। সন্ন্যাসী গোস্বামী তখন তারাদেবীকে বলিলেন—"তারা, অরণ্যকমল দিব্য ছেলে। কি কথা বার্ত্তা ঠিক্ করিলে? এত সুবিধাজনক সকল দিকে আর কোথায় পাওয়া যাইবে?"

তারা,—আমারও বড় ইচ্ছা, তবে তার বাড়ীর লোকের মন না হইলে ত কোন কাজ হইতে পারে না, সে ত এখন কর্ত্তা নহে।

সন্ন্যাসী,—"ছেলের মনের ভাব কিরূপ?"

তারা,—"তা খুব ভাল, যতদূর বুঝা যায় তাহাতে তাহার ইচ্ছা আছে মনে হয়।"

এই সকল কথার পর তাঁহার মিরাট গমনের কথা উঠিল। জীবারাম ঠাকুর একটু বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন, "মা তোমাকে কি বলিব বল? ইংরাজের কার্য্যাদি, সতর্কতা, সাহস ও অধ্যবসায় আশ্চর্য্য। আমরা সব অসার জাতি, পশুজীবন লইয়া মনুষ্যাকারে বাঁচিয়া আছি। ইংরাজী ইতিহাস পাঠ করিলে যাহা জানা যায়, ইংরাজের দৈনিক কার্য্য প্রণালীতে তাহা আরো প্রত্যক্ষরূপে দেখিয়া মোহিত হইতে হয়। কার্য্য গুরুতর, আমি ক্ষুদ্র, কি যে হইবে ভবিষ্যৎই জানে। মিরাটে আমার শিষ্যদল খুব বাড়িয়াছে।"

এই সকল কথা বার্ত্তার পরে সন্ন্যাসী ঠাকুর তারাদেবীর নিকটে আবার সেই দিবসই বিদায় হইয়া শঙ্করানন্দ স্বামী দর্শনে মঠাভি-মুখে চলিয়া গেলেন।

মথুরার লোকে বলিত তিনি তারাদেবীর জনক। কেহ কেহ আবার মনে করিত তাঁহার শ্বশুর-দেব। এ বিষয়ও মত-ভেদ ছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পিতা পুত্র।

জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর রজত রশ্মিধারে ব্রহ্মাণ্ড তরঙ্গায়িত হইয়াছে। যে দিকে নেত্রপাত করা যায় সবই কৌমুদী-স্নাত। দুঃখীর ক্ষুদ্র কুটীর হইতে সম্রাটের রাজ প্রাসাদ সে কিরণে বিভাসিত ও হাস্যময়।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর, অরণ্যকমল একক মুক্ত বাতায়নসন্নিধানে বসিয়া প্রাণস্পর্শী স্বরে বাঁশী বাজাইতেছিল। সে ধ্বনি দিগন্তে ভাসিয়া যাইতে যাইতে প্রকৃতির ঘুমন্তভাব ঈষৎ স্পর্শ করিয়া গেল। প্রকৃতি যেন নয়ন মেলিয়া চাহিলেন, জ্যোৎস্নার উপর আবার জ্যোৎস্না হাসিল। নির্জ্জন নিশীথ জগৎ বিকম্পিত করিয়া সেই মধুর স্বরলহরী মথুরা পুলিনে ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহাতে নির্ম্মল নীলাকাশে পূর্ণচন্দ্রের সহিত অযুত অযুত তারাবলী দীপ্তিভরে মোহিতভাবে ফুটিয়া রহিল। শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবে ব্রজবালার মন উদাস ও মুগ্ধ হইয়াছিল, এ বংশীধ্বনি গরিব বিধবার কুটীরে গিয়া একটী নিদ্রিতা বালিকার হৃদয়ে সুখ স্বপ্নের সঞ্চার করিল। বালিকা ঘুমঘোরে একটু হাসিয়া জননীকে জড়াইয়া ধরিল। বংশী স্বরে অরণ্যকমলের পিতার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তিনি একটু উদ্বিগ্ন হইয়া শয্যাত্যাগ করিলেন। এত

রাত্রি পর্য্যন্ত অরণ্যকমল জাগ্রত, এই ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধ পুত্রের শয়ন ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অরণ্য বিমুক্ত বাতায়নে বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছে এবং অন্যমনে নীলাম্বরে সুন্দর নয়ন-যুগল স্থাপিত করিয়া কি চিন্তায় যেন সকল ভুলিয়া গিয়াছে। রাত্রি কত তাহা তাহারও বোধ নাই। প্রফুল্ল চন্দ্রকিরণ তাহার ঊর্দ্ধস্থিত উজ্জল মুখমণ্ডল আরও রমণীয় করিয়া তাহার শূন্য শয্যার শ্বেত শোভা বাড়াইয়াছে। রাশি রাশি কৌমুদীপাতে গৃহের সমুদায় দ্রব্য সামগ্রী প্রত্যক্ষরূপে নেত্রগোচর হইতেছিল।

অন্যমনস্ক প্রযুক্ত অরণ্যকমল প্রথমে পিতার আগমন বুঝিতে পারে নাই। বৃদ্ধ ধীরে ধীরে পুত্রের নিকটে উপবেশন করিলেন, কিন্তু তাঁহার দ্রুত নিশ্বাস শব্দে অরণ্যকমলের চমক ভাঙ্গিয়া গেল, সে বাঁশী থামাইল। প্রদীপ্ত চন্দ্রালোকে পিতাকে দেখিতে পাইয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। উভয়েই অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। তাহার পর, তাহার পিতা উদয় প্রতাপ সিংহ পুত্রের হস্ত ধারণ করিয়া নিকটে বসাইলেন ও সস্নেহে বলিলেন—

"অরণ্য! এত রাত্রি হইয়াছে তবু তুমি ঘুমাও নাই। আমার—তাই কেমন চিন্তা হইল ও উঠিয়া আসিলাম তোমার কি ঘুম হয় না? আমাকে কেন তাহা বল নাই? ইহাতে যে অসুখ করিতে পারে।" অরণ্যকমল কোন উত্তর দিল না, একটু মস্তক নত করিল। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া উদয় প্রতাপ সিংহ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—

"আমি তোমাকে একটা কথা বলিব বলিব ভাবিতেছি, বলিবার সময় হয় না, বড় দরকারী, না বলিলেও চলে না।

এখনই বলিব মন দিয়া শুন। আমি তোমার বিবাহ দিব, পাত্রী স্থির করিয়াছি, ঘর ও পাত্রী কোন অংশে অযোগ্য নহে। আমাদের বংশে যে বয়সে বিবাহ হয়, তাহা ধরিতে গেলে তোমারও বিবাহের সময় গিয়াছে। আর দেরি করিতে আমার ইচ্ছা নাই। তোমার মত কি জানিতে চাই ও তাহা জানিলেই কার্য্য হইবে। যোগাড় সবই এক রকম করিয়াছি।”

এই অভাবনীয় কথায় অরণ্যকমলের তরুণ বলিষ্ঠ শরীর ঈষৎ কাঁপিল। সেই জ্যোৎস্নালোক, সেই সৌন্দর্য্য প্রস্রবণ সবই তাহার নয়নে অন্ধকারবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সে কম্পিত কণ্ঠে সাহসে ভর করিয়া বলিল “আমি বিবাহ করিব না, এখন আপনার এ বিবাহে আমার মত নাই জানিয়া আপনি তাহাতে ক্ষান্ত হউন।” উদয়প্রতাপ সিংহ পুত্রের এই কথায় অবাক হইয়া রহিলেন। লোক পরম্পরায় শুনিয়াছিলেন যে, তারাদেবীর কন্যাকে সে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, এখন তাহা সত্য বলিয়া মনে করিলেন এবং একটু বিরক্ত ও ততোধিক দুঃখিত হইয়া বলিলেন “আমি থাকিতে তুমি রাজপুত কন্যা ভিন্ন বিবাহ করিতে কখন পারিবে না। ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ করিলে আমার জাতি নাশ হইবে, আমি এই বৃদ্ধকালে সমাজ, জাতি, ও জ্ঞাতি—বন্ধুহীন হইয়া থাকিতে পারিব না। তাহা হইলে আমার অপমানের একশেষ হইবে, অতএব তুমি বিবাহ কর না কর তাহাতে কিছু আইসে যায় না, কিন্তু তুমি ভিন্ন জাতিতে বিবাহ করিবে না, তাহাই আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।”

"এই বলিয়া বৃদ্ধ খানিক নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন "অবশ্য তুমি আমার সকলের ছোট ছেলে, তোমাকে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসি, তোমার জন্য আমি অনেকটা বাঙ্গালীর মত আচার ব্যবহার করি, তুমি যখন যাহা বল তাহাই শুনি ও সমস্ত পালন করি, কিন্তু অন্য জাতিতে বিবাহ করিতে মত দিতে পারি না, আমি জীবিত থাকি আর নাই থাকি তুমি আমার ইচ্ছা ও অভিপ্রায় রক্ষা করিবে। তোমাকে সুশিক্ষিত করিয়া যে সব আশা ছিল তাহা আর নাই, এখন আমার কথা রাখিলেই সকল সার্থক মনে করিব। তোমার বৃদ্ধ পিতার এই স্নেহের অনুরোধ।"

অরণ্যকমল পিতার অসীম স্নেহ ও আশৈশবযত্ন, আদর একে একে সকল স্মরণ করিল,—পিতার বিষণ্ণ, স্নেহময় মুখ চক্ষুর সম্মুখে জীবন্ত ভাবে দেখিতে পাইল, তাঁহার বয়স, তাঁহার অপার সহৃদয়তা সব তখন মনে করিয়া সে যথার্থ বীর রাজপুত যুবকবৎ পিতৃবাক্য প্রতিপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল এবং তৎক্ষণাৎ বলিল,—"আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য, আমি অন্য জাতির কন্যা বিবাহ করিব না। জীবনের আশা ভরসা সুখ সবই আমি আপনার জন্য ত্যাগ করিব প্রতিজ্ঞা করিলাম। কিন্তু আপনি আমাকে আর কোন খানে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিবেন না। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনি আমার বিবাহে অনুরোধ করিলে কেবল আমার শান্তিভঙ্গ হইবে মাত্র।"

বৃদ্ধ মনে মনে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া হর্ষ বিষাদে নিজ কক্ষাভিমুখে মৃদু মন্দ পদে চলিয়া গেলেন।

অবণ্যকমল তেমনি বসিয়া রহিল। শৈশবের আশা, যৌবনের সাধ ও অভিলাষ এবং চির দিনের সর্ব্বস্ব একেবারে সে বিসর্জ্জন করিল তাহার আর দ্বিতীয় চিন্তা কি থাকিতে পারে? এ জগতে যাহা ইচ্ছা করা যায় তাহা পাওয়া যায় না। আমরা যাহা আজীবন প্রাণের সহিত বাসনা করি তাহা পাই কোথায়? মনুষ্য ইচ্ছা করে, ঈশ্বর বিধান করেন, এইত নিয়ম বিশ্বের!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাখি বন্ধন।

বর্ষার সিক্ত ভাব আর নাই, প্রকৃতি যেন অশ্রুকণা, বিন্দু বিন্দু জলধারা নয়ন হইতে মুছিয়া প্রফুল্ল আঁখি প্রসারিত করিয়া চারিদিকে চাহিয়াছেন "ধন ধান্যে ভরা রমণীয়া ধরা।" আবার দিবসে প্রখর রৌদ্র ও নিশিতে নির্ম্মল চন্দ্রকিরণ পাইয়া আরো মনোহরা হইয়াছেন।

"রাখি পূর্ণিমা" পুণ্যভূমি হিন্দুস্থানের একটী প্রধান ব্রত ও পর্ব্ব বিশেষ। পুরাকালে এই "রাখি" বন্ধনে কত গৃহ বিবাদ, কত রাজবিপ্লব ও কত অশান্তি মিটিয়া রাজ্যে কুশলময় শান্তি সংস্থাপিত হইত।

বীরকন্যা রাজপুত মহিলা এই "রাখি" যে বীরের হস্তে বাঁধিয়া দিতেন তিনিই আজীবন ভ্রাতৃস্থানীয় হইয়া আপৎ বিপদে সতত জীবন দিয়াও সাহায্য করিতেন। প্রায়ই "রাখি" বন্ধনের ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ হইত না ও কোন বিশ্বস্ত পরিচারিকার হস্তে তাহা প্রেরিত হইত এবং রাজপুতবালার এই "রাখি" উপহার পাইয়া রাজপুত বীর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ধর্ম্মের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থাকিতেন। ধর্ম্মনিষ্ঠ, স্বাধীন, অলৌকিক রাজপুতের সবই অপূর্ব্ব।

টড সাহেবের "রাজস্থানে" ইহার বিশদ বর্ণনা আছে। তিনিও একজন সাধবা রাজপুত কন্যার "রাখি ভ্রাতা" ছিলেন।

সৌখিন বঙ্গবালা আজ কাল কত রকম লতা পাতা ফুল "পাতান"। তাহাতে আর "রাখি" বন্ধনে কত প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। সৌখীন জীবনের নানাবিধ বিলাসের মধ্যে লতা, পাতা, ফুল, মালা, হাঁসি কান্না ইত্যাদি "পাতান" সম্পর্ক ও আর একটী ক্রীড়া কৌতুকের সামগ্রী মাত্র। সাবস্থ হীন জাতির দৈনিক জীবনের কর্ম্মে তাহা অবিরাম প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অদ্য "রাখি পূর্ণিমা" মথুরার ঘরে ঘরে নব বস্ত্র পরিয়া নর নারী উৎসবে রত। নিমন্ত্রিত বন্ধু বান্ধবের সহিত প্রীতি ভোজে সকলেই একবর্ষ পরে স্নেহবন্ধন আরো দৃঢ়তর করিবার জন্য পরস্পর পরস্পরের হস্তে "রাখি" বাঁধিয়া ভক্তি, প্রীতি ও ভাল-বাসা দ্বিগুণীকৃত করিয়া সুখী হইতেছে। এই আনন্দের দিনে উৎসব কোলাহলপূর্ণ অট্টালিকা পরিহার করিয়া নিরানন্দ অরণ্যকমল ধীরে ধীরে তারাদেবীর কুটীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কাঞ্চনপ্রতিমা অশোকা তাঁহাকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া পুষ্পোদ্যান ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিল। সে উদ্যানে বসিয়া ফুলমালা গাঁথিতেছিল, আর ভাবিতেছিল যে, "অরণ্যকমল আসিলে তাহাকে গ্রথিত মালা উপহার দিবে, মালা পাইয়া অরণ্য কত হাঁসিবে, কত আদর করিবে," কিন্তু অরণ্য-কমলের বিবর্ণ মুখ ও উদ্বিগ্ন ভাব নিরীক্ষণ করিয়া অশোকা নিস্তব্ধ হইয়া গেল এবং তাহার নিকটে নম্রমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। অরণ্য-কমলও কোন কথা কহিল না। তাহাতে বালিকার চক্ষে যেন জল

আসিল, তাহা দেখিয়া অরণ্যকমল নিজের হৃদয়বেগ কতক সম্বরণ করিয়া অশোকার হাত ধরিয়া বলিল "অশোক! আজ "রাখি পূর্ণিমা" কৈ, তুমিত আমাকে নিমন্ত্রণ কর নাই?"

অশোকা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল "তা আমি কেমন করিয়া জানিব যে তুমি আমাদিগের এখানে আজ খাইবে? তোমাদের বাড়ীতে আজ কত আমোদ, কালও তুমি এসো নাই, আমি তাই ভাবিতেছিলাম। আর আজ তোমাকে কেমন খারাপ দেখাইতেছে, তোমার কি কোন অসুখ করিয়াছে, বল না, অরণ কি হইয়াছে? মাকে কি ডাকিব?"

অরণ্য,—"না, না, মাকে ডাকিও না। আমিই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিব।"

অশোকা,—"তোমাকেত কোন দিন এমন দেখি নাই? কেন, তোমার কি হইয়াছে, আমাকে কি বলিবে না? তোমাদিগের বাড়ীর সকলেত ভাল আছেন? বল না, অরণ, তোমার কি হইয়াছে?"

অরণ্যকমল অশোকার আগ্রহ ও অশ্রুভরা আঁখি সহ্য করিতে আর যেন পারিল না, কিন্তু সে যাহা বলিতে আসিয়াছে তাহা শুনিলে বালিকা যে অতিশয় ক্রন্দন করিবে এই ভাবিয়া বক্তব্য সকল কথাই তাহার বাঁধিয়া যাইতেছিল। সোৎসুকভাবে সে অশোকার দিকে চাহিল এবং তাহারও চক্ষে কেমন জল আসিতে লাগিল। অরণ্যকমল নীরবে অশোকার হস্ত ধরিয়া সেখান হইতে পুষ্পোদ্যানে গিয়া কুসুমিত তরুতলে উপবেশন করিল। তাহাদিগের চারিদিকে প্রফুল্ল ফুলকুল হাস্য-মাখা প্রস্ফুটিত ভাবে সুবাস ছড়াইতেছিল, তাহারা সেই সৌর-

ভিত কাননে একত্র ও নিতান্ত অন্ধকার মগ্ন হৃদয়ে বসিয়া অনেকক্ষণ কোন কথা কহিতে পারিল না। অবশেষে অরণ্যকমল উদ্বেলিত মানসিক কষ্ট কতক দমিত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল "অশোক, আমি যাহা বলিতে আসিয়াছি তাহা বড় কষ্টকর। বলিতে আমার মনের যে যন্ত্রণা হইতেছে তাহা আর কি বলিব? আমি যে দিন হইতে তোমাকে দেখিয়াছি, সেই দিন হইতেই ভালবাসি। সেই ভালবাসা এখন কত অসীম ও প্রাণপূর্ণ তাহা তুমিও বুঝিতে পার না, তুমি অদ্যাপি বালিকা, তাই আমার বাহিরের উদাসীন ভাবে এবং দমিত ব্যবহারে আমাকে তুমি হয়ত ঠিক বুঝিতে পার না। তোমার মত প্রিয় আমার আর কেহ নাই, সেই তোমাকে ছাড়িয়া আমাকে দূরে যাইতে হইতেছে। তাহাতে আমার যে কত কষ্ট তা কি বলিব? কিন্তু আমি রাজপুত, এবং পিতার কাছে যা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা রাজপুতের ন্যায় প্রতিপালন করিব। আমি পিতার জন্য জীবনের আশা ভরসা এবং সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতেছি। পিতা আমাকে রাজপুত ভিন্ন কোন জাতিতে, বিবাহ করিতে অনুমতি দিবেন না ও আমাকে তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতে হইয়াছে সুতরাং তোমার সঙ্গে আমার কখনও বিবাহ হইবে না, তাই আমি সকল ছাড়িয়া চিরদিনের মত যাইতেছি আর কখনও গৃহে ফিরিব না। আমি সৈনিক শ্রেণীভুক্ত হইয়া চিরকাল অবিবাহিত জীবনে দিনপাত করিব। তুমি আমার ভগিনী ও আমরণ তোমাকে তেমনি ভাল বাসিব। তোমার সুন্দর কোমল মুখখানি মৃত্যুকাল পর্য্যন্তও আমার মনে জাগিবে। তোমায় এ সকল

বলিতাম না, কিন্তু চিরকালের জন্য যখন তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তাহাতেই আজ সব বলিলাম, তুমি একবার বল অশোক, আমাকেও তুমি এমনি ভালবাস, তাহা শুনিলে ও আমার এ দগ্ধ হৃদয় কতকটা শান্ত হইবে—আমি কতক বাঁচিয়া যাইব। অশোক! বোধ হইতেছে, যেন মৃত্যু আমার সম্মুখে, তুমি রাজপুত মহিলার মত আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে বল দেও অশোক!”

অশোকা উজ্জ্বল আয়ত লোচন দ্বয় প্রসারিত করিয়া নিষ্পন্দ ভাবে অরণ্যকমলের মুখপানে চাহিয়া তাহার প্রত্যেক কথা যেন পান করিতেছিল। অরণ্যকমল থামিল, বালিকার সমস্ত শরীর যেন কাঁপিতে লাগিল, সে কি উত্তর দিবে বুঝিতে পারিল না, কেবল মাত্র তেমনি চাহিয়া রহিল।

অরণ্যকমল তখন আবার ব্যাকুলতা সহ বলিল “অশোক, অশোক, কথা কও, বল তুমি আমাকে ভাল বাস কি না—আমি দেশত্যাগী হইয়া যাইব—তোমারই জন্য, সে আমার মৃত্যু।”

অশোকা অনেক আয়াসে ও চেষ্টায় বলিল, “অরণ তুমি কি জান না আমরা কত তোমাকে ভালবাসি? তুমি এখান হইতে গেলে আমরা কাহার কাছে থাকিব? আমাদের আর কে আছে? তুমি আর ঠাকুরজী ভিন্ন আমরা বাঁচিতে পারি না, তা তিনি সর্ব্বদাই দূরে, তুমিই কেবল আমাদের, তুমি যদি যাও তা হলে আমরা মরিয়া যাইব,” বলিতে বলিতে বালিকার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল—সে নীরবে অঞ্চলে চক্ষু আবৃত করিল।

অরণ্যকমল অনেক যত্নে হৃদয়বেগ প্রশমিত করিয়াছিল, কিন্তু অশোকাকে কাতর দেখিয়া বড় অধীর হইয়া পড়িল—বীর

যুবকের নয়ন সিক্ত হইয়া গেল। রোদনে অধিকাংশ সময় মনের যন্ত্রণা দূরীভূত হয়।

অশ্রু এ সংসারে এক বিচিত্র পদার্থ—অসীম শোক দুঃখে, আবার অপার সুখময় সম্পদে তাহা দেখা যায়; তবে অবস্থা ভেদে তাহার আকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

বহুক্ষণ পরে উভয়ে কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে অরণ্যকমল বলিলেন "এখানে থাকিলে প্রতিদিন তোমাকে দেখিয়া আমি অনন্ত ভাল-বাসার স্রোতে তৃণবৎ ভাসিয়া যাইব। হৃদয় মন স্থির করিতে পারিব কি না তাহা কে জানে, সেই জন্য আমার দূরে যাওয়া ভাল। তুমি আমাকে সাহস দেও, তাঁহার পর যাহা বলি তাহাও শোন, "অশোকা, আজ রাখি পূর্ণিমা, তুমি আমার হস্তে "রাখি" বাঁধিয়া দেও, অদ্য হইতে আমি তোমার ধর্ম্ম ভাই হইব ও যখন যেমন অবস্থায় থাকি না কেন, দূরে বা নিকটে, তোমার বিপদ কালে আমি আসিয়া দেখা দিব। ধর্ম্মের বন্ধনে আজীবন এমনি বাঁধা থাকিব। তুমি আমার ধর্ম্মের বোন—আমি তোমার ভাই, আমার হাতে "রাখি" চিরকাল তোমার স্মৃতি স্বরূপ থাকিবে।"

অশোকা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার চক্ষু মুছিল।

সেই কৌমুদী প্রভাসিত নিশীথ উদ্যানে বসিয়া চন্দ্র তারা নৈশ নীলাম্বর সাক্ষী করিয়া অশোকা অরণ্য কমলের হস্তে নবীন পল্লব লতায় গাঁথিয়া সযত্নে ভ্রাতৃত্বের পবিত্র "রাখি" বাঁধিয়া দিল। কত অজ্ঞানিত অশ্রুবারি, কত দীর্ঘ নিশ্বাস, কত সস্নেহ নীরব দৃষ্টি ও ব্যথিত মনের ভাব বায়ু সঙ্গে অলক্ষিতে মিশাইয়া গেল। বালিকার প্রাণের ব্যথা অরণ্যকমল ভিন্ন কে লক্ষ্য

করিল—আর? এ সংসারে নৈরাশ্যের নিশীথ অশ্রুকণা ও হৃদয়ের গভীর নিস্তব্ধ ক্রন্দনধ্বনি কে কবে সমবেদনার সহিত সান্ত্বনা করিয়া থাকে? স্বজন পরিবেষ্টিত এক ঘরে পৃথক শয্যায় শয়ন করিয়া যখন অন্ধকারে যন্ত্রণার নয়নাসারে উপাধান অভিসিক্ত করা যায় তখন কে তাহা লক্ষ্য করে!

অশোকার নিকট বিদায় হইয়া অরণ্য-কমল তারাদেবীকে সমুদায় বলিয়া সেই "রাখি পূর্ণিমার" রজনী প্রভাতে জনক জননীর নিকট চির বিদায় গ্রহণ করিয়া শান্তি নিকেতন মথুরাপুরী পরিহার পূর্ব্বক প্রবাসে চলিয়া গেল, কে জানে কোথায়? বালিকার শৈশব সুখস্বপ্ন, চিত্তসাধ ও বিধবার মানসিক আশা সব ভঙ্গ হইল—চিরদিনের মত ভঙ্গ হইল।

পিতা মাতার আদরের সন্তান তরুণ যৌবনে সর্ব্ব সুখ ত্যাগ করিয়া তাহাদিগের হৃদয়ের শান্তি হরণ করিল। কিন্তু পুত্রের উচ্চ চরিত্রের উপর অটল বিশ্বাস থাকায়, জাতি নাশের কোন আশঙ্কা তাঁহাদিগের মনে একবারও স্থান পায় নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পীড়া ও দুর্দ্দিন।

অরণ্যকমলের সঙ্গে সঙ্গে যেন তারাদেবীর সাংসারিক সৌভাগ্য একেবারে অন্তর্হিত হইয়া দারিদ্র্য দুঃখ আরো বাড়িয়া উঠিল। সেই হইতে জীবারাম গোস্বামীর আর দেখা নাই। তিনি কবে কোথায় থাকেন তাহার সংবাদ পাওয়া যায় না, কদাচিৎ কখন দুই চারি টাকা ও এক আধ ছত্র পত্র আসিত। তাহাতে ঠিক কিছু জানিতে পারা যায় না, তারিখহীন ও ঠিকানাশূন্য পত্র যশোদা মঠ হইতে মধ্যে মধ্যে আসিত, তাহাই মাতা কন্যার জীবনাবলম্বন। দুঃখিনী তারাদেবীর অবস্থা ক্রমেই নিতান্ত অচল হইয়া দাঁড়াইল। কোন কোন দিন অনশনে বা অর্দ্ধ ভোজনে যাইত। অস্ফুট অশোক-কলিকা নিদারুণ মানসিক উত্তাপে ও দৈনিক অস্বচ্ছন্দতায় বিশুষ্ক এবং মলিন হইতে লাগিল, যে তরুর শীতল ছায়াতে দগ্ধ জীবন জুড়াইবে কত আশা ছিল, অকালে তাহা বিলয় পাইল, বালিকা হৃদয় সহিবে কিরূপে?

মানসিক উদ্বেগে ও অপরিমিত পরিশ্রমে তারাদেবীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল, প্রথম প্রথম তাহা উপেক্ষিত হইয়া, পরিশেষে যখন শরীর আর বহন করিতে পারিল না, তখন তারাদেবী শয্যাগতা হইলেন।

অশোকা মাতার জন্য প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শিল্প কার্য্য ও সামান্য সামান্য পট চিত্র করিত, যশোদা তাহা বাজারে যাত্রী-গণ কাছে ও বাবু দিগের বাসায় লইয়া যাইত এবং বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু আনিত তাহাতেই কোন রূপে তাহাদিগের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হইত, কিন্তু বিধবার চিকিৎসার ব্যয়ভার কুলাইত না। সময়োচিত ঔষধাভাবে ও সুপথ্য বিহীনে রোগ গুরুতর হইয়া উঠিল। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া যশোদা একদিন শঙ্করানন্দ স্বামীর নিকট গিয়া তারাদেবীর জীবন সংশয় পীড়ার সংবাদ দিয়া আসিল। স্বামীজী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ইতস্ততঃ করিয়া জীবারাম গোস্বামীকে মিরাটে পত্র লিখিলেন।

অশোকা অবিশ্রান্ত মাতার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া থাকিত। নয়-নের অবরুদ্ধ বারি, অবকাশে অসম্বরনীয় হইত এবং বালিকা একটু মাত্র সময় পাইলেই রোদনে হৃদয়ের অসহনীয় যন্ত্রণা কতক প্রশ-মিত করিত। অশোকা কখন কখন আবার মাতার ব্যাধি ক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া তিনি যে আর অধিক দিন ইহসংসারে থাকিবেন না, তাহা বুঝিতে পারিয়া ভয়ে কাঁপিত।

অনেক সময় আমরা অনিবার্য্য বিপদ চক্ষের সম্মুখে মূর্ত্তিমান দেখিয়াও তাহা বুঝিতে বা ভাবিতে পারি না কিম্বা ইচ্ছা করিয়াই তাহা মনে আনিতে চাহি না। কল্য যে বিপদ ঘটিবে মানব হৃদয় এমনি দুর্ব্বল যে আসন্ন দুর্ভাগ্য ও প্রিয়জন মৃত্যু আশামোহে শত বার বিস্মৃত হইয়া থাকে। কল্পনায় মুগ্ধ হইয়া ভাবীকাল তাকায় না। যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসি, যে আমাদিগের অধিকতর প্রিয় ও একমাত্র আশ্রয় এবং অবলম্বন সে যে এ জগতে থাকিবে

না এবং অকালে আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবে, একথা কি কখনও চিন্তা করা যাইতে পারে? তাহাতেই মাতার অন্তিম শয্যাও বালিকা ভ্রান্ত মনে আনিতে পারিত না। আশাঘোরে সে প্রতিদিনই জননীর আরোগ্য দেখিত ও সাহসে ভর করিয়া জীবনের কর্ত্তব্য সাধন করিত।

মাঘমাস, তাহাতে আবার পশ্চিমের দুরন্ত অস্থিভেদী শীত, ঘরে থাকিয়াও লোকের আরাম নাই, তাহার উপর সন্ধ্যা হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ও ঝড়বৎ বাতাস আরম্ভ হইয়াছে। এই দুর্যোগে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পথ চলা এক মহা বিপদ। ভিখারী পথিকেরাও এদিনে বিপণিদ্বারে কোন রূপে যেন জীবন রক্ষা করিতে আশ্রয় লইয়াছে। গৃহস্থ গণেরত কথাই নাই, তাহারা অগ্নিকুণ্ড করিয়া গৃহ মধ্যে অবস্থান করিতেছে।

রাত্রি এক প্রহর প্রায়, এমন সময় তারাদেবীর কুটীর দ্বারে কে আসিয়া সজোরে আঘাত করিল। কিন্তু প্রবল বাত্যার শব্দে প্রথমে তাহা কুটীর বাসীর কর্ণে একে বারেই প্রবেশ করিল না। তখন চঞ্চল পথিক আরো সজোরে ব্যাকুল ভাবে বারম্বার দ্বারে আঘাত করাতে সে শব্দ যশোদার কর্ণে প্রবেশ করিল, ও সে অনেক ভাবিয়া, কে আসিয়াছে দেখিবার জন্য কপাট খুলিয়া দিল। দারুণ শীতে ও বৃষ্টিধারে কম্পিত এবং সিক্ত কলেবর পথিক—জীবারাম ঠাকুর দ্রুতপদে কুটীরে প্রবেশ করিয়া স্তিমিত দীপে অন্তিম শয্যাশায়িনী তারাদেবীকে দেখিয়া মস্তকে হস্ত দিয়া তাহার মলিন শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। তারাদেবী গুরুদেবকে দর্শন করিয়া মৃত্যুময় হাস্যভরে ও বিকম্পিত দুর্ব্বল হস্ত তুলিয়া তাঁহাকে

প্রণাম করিলেন। অশোকা ঠাকুরজীকে প্রণাম করিতে গিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। এই অবকাশে বিশ্বাসঘাতক বায়ু মুক্তদ্বার পাইয়া সবেগে কুটীরের প্রদীপটী নির্ব্বাণ করিয়া তাহার চারিদিকে আরো তমসাচ্ছন্ন করিল।

দর্শনের প্রথম আবেগ কতকটা শান্তভাবে পরিণত হইলে, জীবারাম গোস্বামী আর্দ্রবস্ত্র ত্যাগ করিয়া, যশোদা জ্বলিত দীপালোকে তারামণিদেবীর পীড়ার লক্ষণ সকল একে একে আয়ুর্ব্বেদীয় কাশ রোগের সহিত মিলাইয়া দেখিতে ও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। সে রাত্রি অমনি প্রভাত হইল। অন্ধকার রজনী প্রভাতে অশোকা আবার আশালোক দর্শন করিল যেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

তারাদেবীর জীবন কাহিনী।

২৪ পরগণার নিকটবর্ত্তী সুবর্ণপুর গ্রামে অতি সম্ভ্রান্ত বংশে তারাময়ী জন্ম গ্রহণ করে। শৈশব কালে পিতৃ বিয়োগ হইলে তারার মাতা নিজ কন্যা তারাময়ীকে লইয়া ভ্রাতৃ ভবন ভট্ট পল্লীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভ্রাতা বৈষয়িক জ্ঞান শূন্য সুতরাং জ্ঞাতি কুটুম্ব চক্রান্ত করিয়া অল্পদিন মধ্যেই বিধবার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল। তাঁহার সহোদর জীবারাম গোস্বামী কিছুই রক্ষা করিতে পারিলেন না। তারার মাতা বিষয় সম্পত্তি হারাইয়া ও নিদারুণ বৈধব্য শোকে অচিরাৎ লোকান্তর গমন করিলেন। তাঁহার পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা তারা-ময়ীকে ভ্রাতৃ হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলেন কিন্তু তারার ভরণ পোষণের কিছুই রাখিয়া যাইতে পারিলেন না। পিতৃ মাতৃ হীন বালিকা মাতুলালয়ে মাতামহীর নিকট প্রতিপালিতা ও মাতুলের যত্নে শিক্ষিতা হইতে লাগিল।

তারার মাতুল জীবারাম গোস্বামী যৌবনের প্রারম্ভেই স্বদে-শের দুর্গতি দূরীকরণ মানসে ও ম্যাটসিনি প্রভৃতির অপূর্ব্ব জীবন কাব্য এবং ইংরাজী সাহিত্য পাঠ করিয়া স্বদেশ প্রেমে আত্ম সমর্পণ করিতে ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করেন। নবদ্বীপ, বারানসী ও অযোধ্যা

প্রভৃতি পুণ্য স্থানে অধ্যয়ন করিয়া তিনি নানা শাস্ত্রে অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং "স্মৃতিতীর্থ" উপাধি লাভ করিয়া সর্ব্বত্র বহু সম্মান পাইয়াছিলেন। কিন্তু উদাসীন মানসিক অবস্থায় গার্হস্থ্য ধর্ম্মে আর কিছুতেই মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। অস্থির মনেও কার্য্য হীন জীবনে উড়ু উড়ু করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার বংশগত চতুষ্পাঠী ইত্যাদি অযত্নে সব লোপ পাইল, অবিবাহিতা তারা ও বৃদ্ধা জননীকে একক ফেলিয়া কোন খানে গিয়া স্থির হইয়া থাকিতেও পারিতেন না, এইরূপে তাঁহার যৌবনেব কিছু দিন কাটিয়া গেল।

যদিও তিনি বাল্য বিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন তবুও যোগ্য পাত্র পাইলে তারাকে বিবাহ দিয়া এবং জননীকে তাহার নিকট রাখিয়া দেশান্তর চলিয়া যাইবেন স্থির করিয়া ভাগিনেয়ীর পাত্র অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। নানাস্থানে চেষ্টা করিয়া করিয়া অবশেষে সফল মানসে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তৎকালের হিন্দুকালেজের এক জন সুশিক্ষিত যুবক ছাত্র রাজা রাম মোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করায় সমাজচ্যুত হয়। পিতৃ মাতৃ বিহীন সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তনয়কে সকল বিষয়ে উপযুক্ত দেখিয়া জীবারাম ঠাকুর নিজের যথা সর্ব্বস্ব লিখিয়া দিয়া তারা-ময়ীকে তাহারই সঙ্গে বিবাহ দিলেন। চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া তারা গুণবান্ এবং সর্ব্বাংশে যোগ্য পাত্রে সমর্পিত হইল ও জীবারাম গোস্বামী বৃদ্ধা মাতাকে তাহাদিগের নিকট রাখিয়া পূর্ণ যৌবনে কৌমারাবস্থায় সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দেশান্তরে চলিয়া গেলেন।

ভারতের অধোগতি কিরূপে দূরীভূত হইতে পারে তাহা চিন্তাশীলতা সহ ধীরভাবে না ভাবিয়া পণ্ডিত গোস্বামী বৃটিশ-রাজ্যের প্রতিকূলে বিপ্লব প্রচার করিয়া দেশে দেশে শিষ্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাহার কতক আভাষ আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি।

রাজার প্রতি গুপ্ত বিদ্রোহ উত্তেজিত করিয়া কেবল স্বদেশের ও স্বজাতির দুর্ভাগ্য আরো ঘনীভূত করা হয় মাত্র, ন্যায় ও যুক্তি ছাড়িয়া ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করিলে তাহার ভাবী ফল যে প্রকার অমঙ্গল আনয়ন করে, তাহা সন্ন্যাসী গোস্বামীর জীবনে প্রমাণিত হইয়াছিল।

তারাময়ীর স্বামী করুণাময় মৈত্র কলিকাতায় কাজ করিতেন ও তারা তাহার বৃদ্ধা মাতামহী সহ দুই এক বৎসর মাতুল গৃহে বাস করিতে লাগিল। অবকাশ পাইলেই করুণাবাবু পত্নীকে যখন তখন দেখিতে আসিতেন। সাংসারিক পূর্ণতায় ও পতি-প্রেমে তারার বিবাহিত জীবন বড় সুখে কাটিতে লাগিল। তারাও স্বামীর নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সংস্কৃত ভাষা এবং অন্যান্য সুনীতি শিক্ষায় ও নানা প্রকার সৎগ্রন্থ পাঠে কুসংস্কার বিরহিত হয়। সে বাল্যকাল হইতে মাতুলের প্রমুখাৎ স্বদেশের বিষয় শ্রবণ করিয়া ও "মহাভারত" "রামায়ণ" প্রভৃতি অধ্যয়নে দেশের জন্য চিন্তা করিতে শিখিয়াছিল। কিসে পুণ্য-ভূমি ভারতের অবনতি নিবারণ হইবে তাহার মনেও সে চিন্তা সতত জাগরূক ছিল, এবং মাতুলের সহিত ঐ সম্বন্ধে পূর্ণ সহানুভূতি করিত। বিবাহের তৃতীয় বৎসরে তাহাদিগের একমাত্র

কন্যা অশোকার জন্ম হয় এবং সেই বর্ষেই তারার মাতামহী পরলোক গতা হইলে মৈত্র মহাশয় তারাকে কর্ম্মস্থলে কলিকাতায় লইয়া যান। জীবারাম গোস্বামীর পৈতৃক বাস ভবন সেই হইতে জনশূন্যতায় জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। জনপদই গৃহের শোভা ও সম্পদ স্বরূপ। পতিবিয়োগ বিধুরা হিন্দুরমণী, আর মনুষ্য সমাগম বিহীন লোকালয় একরূপ বিষাদময় এবং অশ্রুপূর্ণ।

কলিকাতায় স্বামী কন্যা সহকারে তারা পূর্ণ মাত্রায় গৃহিনী হইয়া নারীর কর্ত্তব্য পালনে এবং পতির স্নেহে সুখময় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল। কেবল মাতুলের অদর্শনে তাহার হৃদয় মাঝে মাঝে বড় ব্যথিত হইত।

মনুষ্যভাগ্য চিরকাল সমান যায় না। অদ্য যে অপার সুখে মুগ্ধ, কল্য সেই আবার দারুণ শোকে ম্রিয়মাণ। সুতরাং তারার সৌভাগ্যসূর্য্য অকালে অস্তমিত হইল, তাহার অপার প্রেমের স্নেহময় স্বামী অসময়ে হটাৎ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। পতির অসহনীয় মৃত্যু শোকে এবং সম্পূর্ণ বন্ধু বান্ধব হীনে তারার জীবন শোচনীয় কষ্টের অবস্থায় পরিণত হইল ও কলিকাতার বাসার সামান্য যাহা কিছু ছিল সে সব বিক্রয় করিয়া তারা অষ্টম বর্ষীকা বালিকা কন্যা এবং বিশ্বস্ত পরিচারিকা যশোদাকে লইয়া আবার সেই পরিত্যক্ত অর্দ্ধভগ্ন মাতুলালয়ে পুনর্ব্বার আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল।

রূপসী যুবতী, বিধবা নিঃসহায়, পিত্রালয়ে কখনই নিরাপদ নহে। তাহাতে আবার তারাময়ীর স্বামী করুণাবাবু ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া প্রতিবাসী মহলে ও দেশে "খৃষ্টান" নামে

অভিহিত। কাজেই তারার এই দুঃখের সময় কেহই সহানুভূতি দেখাইল না বরং গোপনে অখাদ্যভোজী ও কুক্রিয়াসক্ত এবং প্রকাশ্যে "গোঁড়া হিন্দুর দল" তাহার উপর আরো সময় পাইয়া অপ্রকাশ্যে অত্যাচার আরম্ভ করিল। সংসারে বন্ধুতা অনেক সময়ই এই প্রকার।

তারার জীবনের এক বৎসর নিতান্ত কষ্টে ও প্রতিবাসী গণের অযথা ব্যবহারে অসহ্য হইয়া উঠিল কিন্তু নিরুপায় বিধবা কেবল ভগবানের নাম করিয়া ও প্রাণপ্রতিমা কন্যাটীর মুখ তাকাইয়া সে সকল সহিতে বল সংগ্রহ করিল। জীবারাম গোস্বামী লোক পরম্পরায় তারার অকাল বৈধব্য সমাচার পাইয়া এক দিন হটাৎ গৃহে আসিলেন ও রজনী যোগে গোপনে তারাকে দেশান্তরে লইয়া গেলেন। দেশের লোক জন আর সে তত্ত্ব রাখিল না, তাহারা ভাবিল অন্নাভাবে বিধবা কোনখানে কাজ করিতে পলায়ন করিয়াছে।

জীবারাম সন্ন্যাসীর, গুরুদেব শঙ্করানন্দ স্বামী মথুরায় এক নির্জ্জন নিভৃত মঠে সশিষ্যে বাস করিতেন। তাহাতে সর্ব্বদাই গোস্বামীর সেখানে আসিতে হইত এবং মথুরা সেইজন্য তারার পক্ষে নিরাপদ বাসস্থান মনে করিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর বালিকা অশোকা সহ তারাকে সেই স্থানে রাখিলেন। যশোদা তাহাদিগের অভিভাবিকা স্বরূপ নিকটে থাকিল। সেই হইতে "তারাময়ী" "তারাদেবী" নামে জীবারাম গোস্বামীর শিষ্যা পরিচয়ে মথুরায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই তাহার ঘটনাময় সংক্ষিপ্ত জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

চিকিৎসক সমাগম ও তারাদেবীর মৃত্যু।

জীবারাম গোস্বামীর প্রত্যাবর্ত্তনের প্রথম দিবস নানা প্রকার কথায় বার্ত্তায় তারাদেবীর অবস্থা একটু ভাল বোধ হইতে লাগিল। তিনি গোস্বামীকে নিকটে বসাইয়া ধীরে ধীরে কহিলেন "গুরুদেব, আপনি সময় কালেই আসিয়াছেন, আমি অভাবে আপনি একটী যোগ্য পাত্র খুঁজিয়া অশোকাকে সমর্পণ করিবেন। আপনার সম্মুখে আমি যে যাইতে পারিব তাহা কখনও ভাবি নাই। এ সৌভাগ্য আমার আশাতীত। অশোক ও যশো আপনার, আর কি বলিব।" সন্ন্যাসী ঠাকুর তাহাতে বলিলেন, "ভয় কি মা, তুমি শীঘ্র সারিয়া উঠিবে।" কিন্তু এইটী বলিতে তাঁহার চক্ষু অজানিতে আর্দ্র হইয়া গেল।

অশোকা ঠাকুরজীর আগমনে জননীকে কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল এবং আরোগ্য বোধ করিয়া ও অরণ্যকমলের সমাচার পাইয়া আবার আনন্দে বালা-সুলভ-চঞ্চলতা প্রাপ্ত হইল। নিবিবার পূর্ব্বে প্রদীপ যে প্রখর উজ্জলতা লাভ করে বালিকা তাহা বুঝিল না। সে মনে করিল ঠাকুরজী যখন আসিয়াছেন তখন তাহার মাতার

আরোগ্য স্থির নিশ্চয়। কত আশা, কত সাধ ও কত কল্পনার স্রোতে সে ভাসিয়া গেল। আজীবন মনুষ্য পদে পদে নৈরাশ্য-পীড়িত, তথাপি আশামোহে ভ্রান্ত হয়। জীবারাম ঠাকুরের আসিবার তৃতীয় দিবস মধ্যাহ্নে হটাৎ রোগীর অবস্থা পরিবর্ত্তন হইল, তারাদেবী প্রলাপ বকিতে লাগিলেন ও বিকারের লক্ষণ দেখা দিল। সন্ন্যাসী গোস্বামী নাড়ী দেখিয়া তাঁহার আসন্ন মৃত্যু বুঝিয়া উদ্বিগ্ন ও চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন।

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ পরিচয় না থাকিলেও তিনি স্বয়ং পত্র লিখিয়া সরকারী ডাক্তার রমেন্দ্র বাবুর নিকট যশোদাকে পাঠাইয়া দিলেন।

সায়ংকাল সমাগত, কুটীর মধ্যে সান্ধ্য ছায়া একটু একটু প্রবেশ করিতেছে, যেন করাল মৃত্যু ছায়ারূপে সঙ্গোপনে তারাদেবীর জীবন দীপ নির্ব্বাপিত ও ছায়াময় করিতে ধীরে ধীরে সব অন্ধকার করিতেছে। রোগীর শীর্ণ মুখে মলিনতা ক্রমে ছাইয়া পড়িল ও সন্ধ্যার স্তিমিত আলোক নিবিয়া রাত্রি আসিয়া দেখা দিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার বাবুও আসিলেন। অশোকা আগন্তুক সমাগমে চমকিয়া সলজ্জভাবে প্রদীপ আনিয়া সম্মুখে ধরিল। তখন প্রদীপ্ত দীপালোকে এক দিকে রোগীর অন্তিম অবস্থা ও মৃত্যুর অন্ধকার ছায়া এবং অন্য দিকে নব যৌবন বিকাশের অপূর্ব্ব মাধুরী—নবীন শোভা ও অমরাবতী বৈভব সম বালিকার অতুলনীয় এবং অপার্থিব রূপরাশি নিরীক্ষণ করিয়া রমেন্দ্রনাথ ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া নীরবে আত্মবিহ্বল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর সন্ন্যাসীকে সম্মুখে উপবিষ্ট দেখিয়া কতক আত্মসংযম

করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। তাঁহার জীবনে এই কুটীর দৃশ্য অভাবনীয়, ও সবই অমানুষিক। রোগীর অবস্থা যন্ত্র সহকারে একে একে পরীক্ষা করিয়া তিনি গোস্বামীর দিকে চাহিলেন ও উভয়ে একত্র একটু দূরে গিয়া মৃদুস্বরে কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

রমেন্দ্রবাবু বলিলেন "মহাশয, রোগীর আর বাঁচিবার আশা নাই। সময় প্রায় হইয়া আসিয়াছে, এখন ঔষধ দেওয়া বৃথা। কাশ রোগের চরম অবস্থা, এখন যাহা করিতে হয় করুন। একেবারে শেষ সময়ে আমাকে ডাকিয়াছেন। যখন পীড়ার সূচনা হইয়াছিল তখন দেখিলেও চিকিৎসা করিয়া দেখা যাইত। যদিও এরোগ অনারোগ্য, তবুও সুসময় কালে দেখিলে এত শীঘ্র মৃত্যু বোধ হয় ঘটিত না।"

জীবারাম ঠাকুর চিকিৎসকের কথায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন—

"আমার অযত্নেই সব ঘটিয়াছে এবং আমি বুঝিয়াছি যে আর জীবনের আশা নাই। তবে ইহার অভাবে এই নিরুপায় বালিকার কি হইবে এই চিন্তায় ভ্রান্ত মনে আপনাকে ডাকিয়াছি, যদি কোন উপায় থাকে তাহা করিয়া আপনি ইহাকে বাঁচাইতে পারেন কি না। আমার সব বুঝিতে বাকী নাই, শেষ রাত্রেই সকল ফুরাইয়া যাইবে।"

"তবে মহাশয, আমি চলিলাম, যদি রোগী জীবিত থাকেন ত আমাকে কল্য প্রাতে আর এক বার সংবাদ দিবেন," বলিয়া ডাক্তার বাবু সন্ন্যাসী দত্ত অর্থ ফিরাইয়া দিয়া বাসায় প্রস্থান

করিলেন। কিন্তু অকাল মৃত্যুর অন্ধকারে যে অলৌকিক মহিমা-ময়ী তরুণী বালিকা রত্ন দেখিয়া আসিয়াছিলেন কেবল তাহাই তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। সেই অশ্রুসিক্ত গোলাপ পুষ্প, শোভাময় কাতর মুখ মণ্ডল, সুবঙ্কিম ভ্রূযুগল ও ত্রিকোণ ললাট, অযত্ন সম্ভূত কুঞ্চিত অলকদাম জড়িত এবং ভাবভরা চঞ্চল আয়ত নয়নদ্বয়, প্রীতিরাগে ঢল ঢল করিতেছে, রমেন্দ্র বাবুর মানস-নেত্রে তাহাই দীপ্তিভরে ফুটিয়া রহিল। তিনি জাগ্রতে বা নিদ্রায় স্বপ্নে তাহা দর্শন করিয়া আত্মহারা হইয়া গেলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া গণনায় ও প্রতিদানের প্রতীক্ষায় প্রেম জন্মে না, তাহা স্বর্গীয় পদার্থ, স্বতঃই মনুষ্য হৃদয়ে আবির্ভাব হয়। যাহার প্রতি ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন, সে প্রেমের সফলতায় কৃতার্থ হইয়া থাকে, আর যে দুর্ভাগ্য সে নৈরাশ্যেই পুড়িয়া মরে। যাহার মন প্রেমশূন্য ও যে হৃদয়হীন সে মনুষ্য নামের যোগ্য নহে, নিকৃষ্ট জীবসম জগতে বিদ্যমান থাকিয়া পশু জীবন বহন করে মাত্র।

গভীর নিশীথে অনিন্দিন্দিত তারাদেবী ইহ জগতের রোগ, শোক, দুঃখ জ্বালা ও মায়া মোহ পরিহার করিয়া অনন্তদেবের পদ-প্রান্তে ধীরে ধীরে আশ্রয় লইলেন। তাহার সহিত অপরের আশা, সুখ চিরদিনের মত বিলীন হইয়া গেল। স্নেহময়ী জননীর সংক্ষিপ্ত জীবনের সুখ দুঃখময় কাহিনীর স্মৃতি, মাতৃ বিয়োগ বিধুরা বালিকার হৃদয়ে আজীবন সমান ভাবে অঙ্কিত রহিল, কেবল সংসার ত্যাগী জীবারাম ঠাকুর অদ্যকার শোকে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বালিকার সহিত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শঙ্করানন্দ স্বামীর অনুগ্রহ প্রেরিত শিষ্যগণ যথা সময়ে উপস্থিত হইয়া তারাদেবীর সৎকার

করিয়া গেলেন। শূন্য শয্যা, শূন্য কুটীর ও অনাথ বালিকা অশোকা অন্ধকারে পড়িয়া রহিল। সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করিয়াও গোস্বামী ঠাকুর সাংসারিক শোক, দুঃখ, চিন্তা হইতে মুক্ত পাইলেন না। মায়ায় জড়ীভূত হইয়া তাঁহাকেও গৃহীর কষ্ট ভোগ করিতে হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রস্তাব ও পরিচয়।

শোকের বিষাদ শর্ব্বরী প্রভাতে কুটীরের চতুর্দ্দিক তেমনি আবার নবারুণে ও সুখ সূর্য্যকরে আলোকিত এবং প্রভাসিত হইল, কেবল কুটীরবাসী তিন জনের অন্তর তেমনি দুঃখের ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়া গেল।

মাতৃশোক কাতরা অশোকা আলুলায়িত কেশে ঠাকুরজীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া ভূমিতলে পড়িয়া আছে, পার্শ্বে বিবশা যশোদা, থাকিয়া থাকিয়া রোদন করিতেছে ও গোস্বামী ঠাকুর নিস্তব্ধভাবে অধোমুখে বালিকার অবস্থা ভাবিতে ভাবিতে চক্ষুজল মুছিতেছেন। তখনও কাহারও স্নানাহার হয় নাই। রৌদ্রের তেজ যেন তাহাদিগের দুঃখে আরও প্রখর হইয়াছে, কিন্তু তাহারা আজ নিঃসহায়, এ দুর্দ্দিনে তত্ত্ব লইবার কেহ নাই। অরণ্যকমল দেশান্তরে, তাহার পিতা মাতা এখন অশোকার খোঁজ করিবেন কেন? তাহারা সেই হইতে তাহাদিগের উপর অনুরাগহীন ও অসন্তুষ্ট।

এ সংসারে শোক দুঃখে পূর্ণ সহানুভূতির এমনি অভাব। এ দুঃখের দিনে কে আর সান্ত্বনা করিতে আসিবে বল?

রমেন্দ্র বাবু যখন দেখিলেন যে, তাঁহার নিকট সংবাদ দিতে কোন লোক আসিল না তখন তিনি একটু উদ্বিগ্ন হইলেন ও রোগীর

মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া তারাদেবীর কুটীরে যাওয়াই স্থির করিলেন। সেখানে আসিয়াই বাহিরের অবস্থাতে তিনি কুটীরের আভ্যন্তরিক শোকাচ্ছন্ন নীরব ক্রন্দন দিব্য বুঝিতে পারিয়া মৃদুমন্দ পদবিক্ষেপে ধীরে ধীরে ঠাকুরজীর নিকটে গিয়া উপবেশন করিলেন। সকলেই বাক্যহীন, চেষ্টা করিয়াও সন্ন্যাসী প্রথমে কোন কথা কহিতে পারিলেন না, তখন ডাক্তার বাবুই একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—

"আমার বোধ হইতেছে এখনও আপনাদিগের আহার হয় নাই এবং বেলাও প্রায় যায় যায়, যদি অপরাধ না লন ত আমি কিছু খাবার আনাই, কি অনুমতি করেন ?"

গোস্বামী উপস্থিত উদ্বেলিত শোকবেগ কথঞ্চিৎ নিবারিত করিয়া কহিলেন—

"আপনার মহাশয় বড় অনুগ্রহ, তাই এই অসময়ে আমা-দিগের তত্ত্ব জানিতে আসিয়াছেন। বালিকাটীর জন্যই সকল দর-কার, তা, কিছু আহারের আনিতে আমার কোন আপত্তি নাই।" অশোকা উপবাসী আছে, কাজেই খাদ্য আনিতে গোস্বামীর অমত হইতে পারে না।

যশোদা রমেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবে ও ঠাকুরজীর আদেশে অশোকাকে লইয়া অন্যত্র উঠিয়া গেল। অবকাশ পাইয়া সন্ন্যাসী অশোকা সম্বন্ধে অন্য কথা তুলিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন,—

"আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি, দেখিতেছেন,—এই বালিকারও আর কেহ নাই, এক মা ছিলেন, তিনিও চলিয়া গেলেন, তাই

ভাবিতেছি কি করিব? আপনি যদি কোন পরামর্শ দেন সেই জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি কোন পাত্র খোঁজ করিয়া দিতে পারেন কি? আমিত সন্ন্যাসী পথিক, আজ এখানে আছি, কাল কোথায় থাকিব তাহা ঠিক জানি না। পথে পথে বেড়ান আমার কাজ। ভিখারী সন্ন্যাসী আমি, গৃহীদিগের সহিত আমার সংশ্রব কম, আমার দ্বারা কোন প্রকার খোঁজ তল্লাস হওয়া অসম্ভব। মহাশয় অসময়ে অনুগ্রহ দেখাইতেছেন বলিয়াই আপনাকে বলিতে সাহস করিতেছি, একটী পাত্র খুঁজিয়া দিতে পারিলে বড় উপকার করা হয়।"

রমেন্দ্র নাথ অনেকক্ষণ অন্যমনে শূন্য চাহিয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না, তাহার পর একটু ভাবিয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন;—

"আমি এই বালিকার সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহি। আপনার পরলোক গতা শিষ্যার নাম ও খ্যাতি আমার শুনা আছে বটে, তথাপি ইহারা আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। যদি এই বালিকা ভদ্র বংশজাত হয় তাহা হইলে অনেক ভাল লোকে বিবাহ করিতে পারে। মেয়েটী যেমন অপূর্ব্ব সুন্দরী ও শান্ত প্রকৃতি তাহাতে লোকের আপত্তি তত নাই হইবার কথা।"

তখন গোস্বামী ঠাকুর অশোকার জীবনের সমুদায় খুলিয়া বলিলেন ও তাহা শ্রবণ করিয়া বৈধময় রমেন্দ্র বাবু আপনি ঘটক হইয়া অশোকাকে বিবাহ প্রস্তাব করিলেন।

এ পৃথিবীতে রূপের প্রভাব অসীম। ইহাতে ব্রহ্মাণ্ড পরাজিত হইয়া থাকে। সম্রাট হইতে অসভ্য বর্ব্বরগণ পর্য্যন্ত এই সৌন্দর্য্যের

উপাসক। কত মহা মহা বীর, এক সময় যাহারা পৃথিবী করতলস্থ করিযাছে তাহারাই আবার রূপের তরঙ্গে তৃণবৎ ভাসিয়া গিয়াছে, এ আকর্ষণ সকল অপেক্ষা গুরুতর। ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য এবং অসংখ্য গুণরাশি রমণীর রূপের তুলনায় কিছুই নহে যেন। রূপসীর রূপে এমন একটী মোহ আছে যাহার নিকটে এ বিশ্বজগৎ নতশির ও বিমুগ্ধ। পার্থিব জীবনে সকলেরই প্রায় এমন একটী সময় আইসে যখন মনুষ্য চিত্ত কেবল-মাত্র সৌন্দর্য্যের ভোগ লালসায় আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়।

সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতিকে আমরা আমরণ ভালবাসি, কেননা তাহার চির প্রস্ফুটিত রূপেব মহিমায় আমাদিগের হৃদয় নিত্যই মোহিত, তাই তাহাকে আমরা অযাচিতে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসি, প্রতি-দান চাহি না। তেমনি রূপবতী নারীর পবিত্র রূপ চিরপূজ্য ও আদরনীয়। প্রকৃতি রূপসী প্রতিভাময়ী রমণী স্বরূপা ও সর্ব্বত্র বিশ্বজন সদনে জীবন্ত শক্তি রূপিনী মহামায়া, প্রত্যেক হৃদয় আশৈশব তাহার উপাসক। এই পৌত্তলিকতা প্রিয়, সৌন্দর্য্যভক্ত পুরুষসহ প্রকৃতি এক রমণীয় উচ্চ সম্বন্ধে সমন্বিত।

ডাক্তার রমেন্দ্র নাথ বক্রবর্ত্তী রাঢ় অঞ্চলের লোক। মেডিকেল ক্যালেজে প্রতিষ্ঠা সহিত পারদর্শিতা লাভ করিয়া মথুরায় সরকারী কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার পত্নী বিয়োগ হওয়াতে এখন তাঁহার গৃহশূন্য। এক বৎসরের একটী শিশু সন্তান রাখিয়া তাঁহার ভার্য্যার কাল হয় এবং দুগ্ধপোষ্য নিরুপায় পুত্রটী লইয়া তিনি বড় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ধাত্রী দ্বারা কোনরূপে তাহার লালন পালন চলিতেছিল মাত্র। গৃহিনী শূন্য

গৃহ পান্থশালাবৎ শ্রীভ্রষ্ট ও গোলযোগময়। শোভা সম্পদ সৌভাগ্য থাকিয়াও যেন সব ঘোর অন্ধকার এবং বিশৃঙ্খল। তাহাতে আবার দূর প্রবাসে, একক থাকিতে হয় ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিরল বেহারী ভৃত্যগণের প্রসাদে ডাক্তার বাবুর ভাগ্যে প্রায়ই উপবাস ঘটিত। তিনি অতি শান্ত স্বভাব ও নিরীহ ব্যক্তি। দাস দাসী এবং অনুগতদিগের প্রতি একটু বেশী মাত্রায় কর্ত্তব্য পরায়ণ ও কৃপালু ছিলেন সুতরাং ভার্য্যার অবর্ত্তমানে তাঁহার সাংসারিক অবস্থা দিন দিন শোচনীয়তর অসহনীয় হইয়া উঠিল। শীতল মেজাজও মধ্যে মধ্যে গরম করিতে বাধ্য হইতেন, কিন্তু প্রভুভক্ত পরিচারক পরিচারিকাগণ তাহাতে কার্য্যাদি সুনিয়মে সমাধা করিতে গিয়া ভয়ে আর একটা বিভ্রাট করিয়া ফেলিত। লাভের মধ্যে তিনি আরও জ্বালাতন হইয়া উঠিতেন। রমেন্দ্র বাবু যুবক ও সুপুরুষ, কেবল মাত্র ত্রিংশৎবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন, জীবনের সবে আরম্ভ, সম্মুখে কত বৎসর এখনও পড়িয়া আছে। সুখ সৌভাগ্য সংসার যাহাকে বলে সে সকলেরও অভাব ছিল না, সাংসারিক অবস্থা দিব্য ও ব্যবসায় যথেষ্ট আয় ছিল; ভোগ করিবার কেহ নাই সেই যাহা দুঃখ, সুতরাং তাঁহাকে পুনঃ পরিণয় করিতে আত্মীয় স্বজন বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনিও দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। তবে এবারে তিনি স্বয়ং দেখিয়া শুনিয়া একটী সুন্দরী ও শিক্ষিতা বালিকার পাণি গ্রহণ করিবেন মনস্থ করায় বিবাহে ততটা তাড়াতাড়ি মনোযোগ দেন নাই। তাঁহার পূর্ব্বপক্ষের ভার্য্যার রূপের খ্যাতি তেমন ছিল না, তাহাতে অতৃপ্ত সৌন্দর্য্য আকাঙ্ক্ষাটা হৃদয়ে প্রবল ছিল ও

তাঁহার নিকট অধিকতর মূল্যবান্ বোধ হইত। মনের ও সংসারের যখন এই প্রকার অভাবময় অপূর্ণ অবস্থা তখন রমেন্দ্র নাথ আশোকার নিরুপম রূপে আত্ম সমর্পণ করিয়া অন্যান্য অসুবিধা স্বীকার পূর্ব্বকও পরিবারবর্গের অজ্ঞাতে স্বয়ং উপযাচক হইয়া তাহার সঙ্গে বিবাহ স্থির করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ ও স্থানান্তর।

জীবারাম গোস্বামী গৃহীর আয়োজনে রমেন্দ্র নাথ সহ অশোকার বিবাহ দিলেন ও স্বয়ং কন্যা সম্প্রদান করিলেন। উপযুক্ত পাত্রে যথা সময়ে অশোকা-সমর্পণ করিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর দায় মুক্ত এবং নিরুদ্বেগ হইয়া আবার দেশ পর্যটনে বহির্গত হইবার জন্য অশোকার নিকট বিদায় লইলেন। তাঁহার সে চির-বিদায়, কত অশ্রুনীরে পরিপ্লুত ও স্মৃতিময়। অশোকা তাঁহাকে বিদায় দিতে পুনর্ব্বার যেন মাতৃশোক অনুভব করিয়া ব্যথিত হইল এবং অবকাশ পাইলেই গোপনে কত রোদন করিত, যশোদা তাহাকে সান্ত্বনা করিতে গিয়া নিজেই অধীরা হইয়া পড়িত।

বিবাহ অন্তে অশোকা যশোদা সমভিব্যাহারে স্বামী ভবনে আসিয়া বাস করিতে লাগিল কিন্তু জননীর মৃত্যুশোকে ও অরণ্য-কমলের অদর্শনে তাহার নিরানন্দ হৃদয় তেমনই তমসাবৃত রহিয়া গেল। নব পরিণয়ের সুখানুভব করিতে পারিত না এবং অন্য মনে শূন্য দৃষ্টিতে মুক্ত গবাক্ষ ধারে দাঁড়াইয়া অশ্রুধারা মুছিতে মুছিতে শৈশবের সেই প্রিয় কুটীর, মাতার সেই অনন্ত স্নেহ ও প্রাণপূর্ণ ভালবাসা, অরণ্যকমলের সেই সরল প্রীতিমাখা সৈখ্য-ভাব এবং শান্তিময়ী যমুনা একে একে কল্পনায় দেখিতে পাইত ও

বর্ত্তমান জীবনের সমুদায় ভূতকালে বিসর্জ্জন করিয়া বালিকা কত কথা চিন্তা করিতে করিতে পরিণয় এবং স্বামী প্রেম ভুলিয়া যাইত।

রমেন্দ্র নাথের শিশুটী অশোকার জীবন স্বরূপ হইয়া উঠিল, তাহাকে ছাড়িয়া সে মুহূর্ত্ত কালও থাকিতে পারিত না। শিশু তাহাদের যত্ন আদর ও স্নেহে দিন দিন সুস্থ সবল এবং প্রফুল্ল হইতে লাগিল। এক মাতার পরিবর্ত্তে শিশু দুই মাতা অশোকা ও যশোদাকে পাইয়াছিল।

একে দ্বিতীয় পক্ষ, তাহাতে আবার পত্নী অসাধারণ সুন্দরী ও তরুণী বালিকা, কাজে কাজেই রমেন্দ্র বাবু তাহাকে একদণ্ড চক্ষের অন্তরাল করিতে পারিতেন না " পলকে প্রলয় " গণিতেন। অশোকাও নিতান্ত অনুগতা, আজ্ঞানুবর্ত্তিনী এবং সুশীলা। স্বামী যখন যাহা বলিতেন অতি আগ্রহে, যত্নপূর্ব্বক তাহা সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিত, তাহাতেই তাহার গৃহ কার্য্যে অপার-দর্শিতার জন্য তিনি কোন ত্রুটি ধরিতেন না ও তাহা কখন ভাবিতে অবসরও পাইতেন না। যশোদা সেই সকল ছোট খাট অভাব সারিয়া লইত।

এক দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে রমেন্দ্র নাথ সরকারী কার্য্য শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি বাসায় আসিলেন ও শয়ন ঘরে গিয়া অশোকাকে ডাকিয়া অতি আদরে নিকটে বসাইয়া তাহার সুন্দর মুখখানি বুকে রাখিয়া সস্নেহে কহিলেন,

"অশোক, তোমাকে একটা নূতন খবর দিব, তুমি হাঁসিবে ত? একবার হাস অশোক, আমি দেখি, তা দেখিয়া চোখ

জুড়াই। তুমি অমন বিষণ্ণ হইয়া থাকিলে আমার বড় কষ্ট হয়, তাহা কি তুমি জান না? ”

বালিকা নীরবে সলজ্জভাবে বিশাল নয়ন আরও প্রসারিত করিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল, কি যে বলিবে স্থির করিতে পারিল না।

রমেন্দ্র বাবু তখন আরও আগ্রহে, আরো আদরে তাহাকে নিকটে টানিয়া লইলেন। অশোকা খানিক পরে আয়াস সহকারে একটু থামিয়া থামিয়া বলিল, “ তা, তুমি আমায় আগে বলো, কি খবর। কেন, আমিত এখন হাসি। আমাকে বলো কি নূতন খবর। ”

রমেন্দ্র নাথ পত্নীকে হাস্যময় ও প্রফুল্ল দেখিতে ভাল বাসিতেন ও সেই নিমিত্ত যখন তখন হাসিতে বলিতেন এবং আদর করিতেন, কিন্তু বালিকার মানস-তত্ব বুঝিতেন না। সে যে স্বামী প্রেমের মধুরতা তখনও অনুভব করিতে অসমর্থ এবং অরণ্যকমল তাহার স্মৃতির কক্ষায় কক্ষায় দীপ্তি পাইতেছিল তাহা তিনি জানিতেন না। রমেন্দ্র নাথ পুনর্ব্বার কহিলেন, “ আমাকে তুমি আদর কর, ও হাসিয়া কথা কও তবেত তোমাকে সে খবর বলিব অশোক! ”

অশোকা লজ্জায় কোনই কথার উত্তর দিতে পারিল না। কিন্তু স্বামীকে আদর দেখাইতে ও তাঁহার কথায় সলজ্জ স্নেহভরে তাঁহাকে একটি চুম্বন করিয়া স্বামীর হৃদয়ের মধ্যে মুখখানি আরও লুকাইল।

রমেন্দ্র নাথ সেই চুম্বন পাইয়া উচ্ছ্বাসিত সুখে যেন দ্রবীভূত

হইয়া কহিলেন—"তোমাকে আমি বড়ই ভালবাসি অশোক, তারপর শুন, আমি লক্ষ্ণৌ বদলী হইয়াছি ও সপ্তাহ মধ্যেই আমাদিগের সেখানে যাইতে হইবে। তুমি কত নূতন জায়গা, কত নূতন লোক দেখিবে। সেখানে দেখিবার অনেক ভাল ভাল জিনিষ আছে! তাহা দেখিলে তোমার শরীর ও মন ভাল হইবে। এখন একবার তুমি হাস। দেখ দেখি কেমন ভাল খবর?"

অশোকা শুনিয়াছিল যে অরণ্যকমল লক্ষ্ণৌ আছেন, তাই তাহার কত কথা একে একে আশায় মনে আসিতে লাগিল ও সে একটু মৃদু হাসিয়া সচঞ্চল ক্রীড়াশীল খোকাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া যশোদাকে খবর দিতে গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিপ্লব।

সিপাই বিপ্লবের প্রধূমিত ঘোর বহ্নি পশ্চিমের নানাস্থানে সহসা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ১৮৫৭ সালের ১০ই মে তারিখে মিরাট সহরে ক্ষিপ্ত সিপাইগণ মুক্তভাবে হঠাৎ কারাগার ও ইংরাজ সৈনিক নিবাস ভাঙ্গিয়া ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষগণকে স্ত্রী পুত্র সহ অযথা হত্যা করিল। কত নিরপরাধী বৃটিশ কর্ম্মচারী তাহাদিগের হস্তে অকালে জীবন হারাইল।

এই শোচনীয় পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে ভারতের চতুর্দ্দিকে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সে সমাচারে রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে বড় লাটের স্থির সিংহাসন টলিল এবং বড় বড় ইংরাজ "মহলে" ভীতি উৎপাদন করিল। উন্মত্ত বিদ্রোহীগণ অদ্য এখানে কল্য সেখানে, গুপ্তভাবে, কখন বা প্রকাশ্যে ইংরাজদিগকে হত্যা ও তাহাদিগের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সকলেই আপন আপন প্রাণ লইয়া বিব্রত, কেহ কাহাকে সাহায্য করিতে অবকাশ পায় না। সজ্জিত অট্টালিকা ও নানাবিধ ভোগ বিলাস পরিহার করিয়া বিলাসিনী ইংরাজ রমণী গোপনে সামান্য পরিচারিকার বেশে যে "নিগারকে" পদ দলিত করে সেই "নেটিব নিগার" দীন কৃষকের পর্ণশালায় জীবন রক্ষার্থে

আশ্রয় ভিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগের অপার দয়ায় ও মনুষ্যত্বে, কখন কখন নিরাপদ হইয়া কোন রূপে প্রাণ বাচাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই সময় সার হেন্‌রি লরেন্স সাহেব (Sir Henry Lawrence) অযোধ্যার চিফ্ কমিশনার (Chief Commissioner)। তিনি তৎকালে লক্ষ্ণৌ অবস্থিত হইয়াও নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও বিদ্রোহীদিগকে বশীভূত এবং নিরস্ত করিতে পারিলেন না এবং অবশেষে তাহাদিগের হস্তেই সাংঘাতিক রূপে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

সেই সময় তাঁহার অধীন অন্যান্য কর্ম্মচারীর ন্যায় রমেন্দ্র বাবুও লক্ষ্ণৌ সহরে সৈনিকদিগের চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বিদ্রোহের সমরকালীনই তিনিও সেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। সদা সর্ব্বদা ইংরাজ শিবিরে তাঁহাকেও যাতায়াত করিতে হইত এবং তাহাদিগের সহবাসে ও কর্ত্তব্যানুরোধে অধিকাংশ সময় বিদ্রোহীগণের প্রতিকূলে কার্য্যাদি করিতেন। তাহাতে তিনিও বিদ্রোহীদিগের কোপ দৃষ্টিতে পড়িয়া বিপদগ্রস্ত হন।

ডাক্তার বাবু ঔষধ সহ মদিরা মিশ্রিত করিয়া সিপাইগণের জাতিনাশ করিয়া থাকেন ও ইংরাজের সাহায্যকারী অতএব তাঁহাকেও সপরিবারে বিনাশ করিবার ষড়যন্ত্র হয় এবং তাহা অচিরাৎ লক্ষ্ণৌ নগরীর চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়ে, অন্তঃপুরে অশোকার কর্ণেও ত্বরায় সে বার্ত্তা পৌঁছিল। তখন তাহারা রমেন্দ্র বাবুর মানসিক উদ্বেগের ও চিন্তার গূঢ় কারণ বুঝিতে পারিয়া অতিশয় ভীত হইয়া পড়িল।

আষাঢ় শ্রাবণ মাস, তবুও বর্ষার কোন লক্ষণ নাই, সূর্য্যদেব জানি না কাহার উপর উত্তপ্ত হইয়া সোণার লক্ষ্মৌ নগরী দগ্ধ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন। দারুণ গ্রীষ্ম, রৌদ্রের উত্তাপে যেন অগ্নি-বর্ষণ হইতেছে। রাজপথ, পান্থশালা, বাজার বিপণি সব জনশূন্য। রাজ প্রাসাদ হইতে মৃণ্ময় কুটীর পর্য্যন্ত সব যেন পরিত্যক্ত ও অবরুদ্ধ, সাহস করিয়া কেহ দ্বার খুলিতে পারে না। সর্ব্বত্র ভয়ের বিভীষিকার ছায়াচ্ছন্ন এবং শূন্যতা পরিব্যাপ্ত। এই শোচনীয় সময়ে এক দিন মধ্যাহ্নকালে রৌদ্রের প্রখর তেজে পুড়িতে পুড়িতে রমেন্দ্র বাবু ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অসময়ে বাসায় আসিয়া ব্যস্তভাবে অশোকাকে ডাকিলেন। স্বামীকে এই প্রকার অবস্থায় অসময়ে গৃহ প্রত্যাগত দেখিয়া সেও তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

রমেন্দ্র বাবু একটু স্থির হইয়া কহিলেন—

„ অশোক, আমার বড় বিপদ। বিদ্রোহী সিপাইগণ আমাদিগকে মারিবার চক্রান্ত করিয়াছে ও আজ, কালের মধ্যেই আমাদিগের বাঙ্গালায় আসিয়া পড়িবে। আমাদিগকে খুন করিয়া সকল লইবে, ঠিক করিয়া এখানে ওখানে লুকাইয়া আছে, কখন কি করে বলা যায় না। এখানে থাকিলে আমরা আর বাঁচিব না। তাই আমি তোমাদিগকে লইয়া দুই এক দিনের মধ্যেই দেশে চলিয়া যাইব। এখানে যে কয়দিন কার্য্যগতিকে থাকিতে হয় গোপনে থাকিব। কাল হইতে আর রেসিডেন্সিতে যাইব না, সাহেবকে বলিয়া আসিয়াছি। তুমি নগদ টাকা নোট ও তোমার গহনা গুলি এখনি সব গুছাইয়া ব্যাগে বন্ধ কর। আর দরকারী

কাগজ পত্র গুলাও চাবি আমার কাছে যা আছে তাহা আমি ঠিক করিতেছি। সময়ত নাই, "তেওয়ারী ঠাকুরকে" ডাকিতে বলো। যশোকেও ডাক।"

অশোকা ইহা শুনিয়া একপদও স্বামীকে ছাড়িয়া নড়িল না এবং তাঁহার স্কন্ধে হস্ত দিয়া তেমনি অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যশোদা বাহির হইতে ঐ সকল কথা শুনিতে পাইয়া তখনি সেখানে আসিল ও খোকাকে অশোকার কাছে দিয়া কহিল, "ভয় কি মা, তুই খোকাকে রাখ্, আমি সব গুছাইতেছি। আমরা থাক্‌তেই তোর এত ভয়? বাবু যা বলেন আগে তাই কর্ আর আমি কর্‌ছি।"

রমেন্দ্র নাথের সমুদায় দ্রব্য ও টাকা কড়ি চাবি ইত্যাদি এবং অশোকার অলঙ্কার সব যশোদার নিকটেই থাকিত। সেই গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী।

যশোদা বাল বিধবা এবং ভদ্র কায়স্থ কন্যা, কষ্টে পড়িয়া তারাদেবীর আশ্রয়ে আসিয়াছিল এবং সেই হইতে অশোকার দ্বিতীয় মাতৃরূপিনী ও চিরহিতৈষিণী বিশ্বস্ত পরিচারিকা। গৃহকার্য্য প্রভৃতি তাহার সাহায্য ভিন্ন চলিত না। আপ্যায়িত করিতে এবং বুদ্ধি বিবেচনায় ও স্নেহ মমতায় সে সুনিপুণা গৃহিনীবৎ। সাংসারিক ব্যাপারে প্রৌঢ়া যশোদা রমেন্দ্র বাবুর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ এবং ত্যাগ স্বীকারে সে আদর্শচরিত্র ছিল। অবলম্ব জীবনে সে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়া প্রতিপালকের প্রত্যুপকার করিতে নিয়ত যত্নবতী থাকিত।

রমেন্দ্র বাবু দেশে যাইবার সমুদায় বন্দোবস্ত স্থির করিয়া সতর্কভাবে গৃহের চতুর্দ্দিকের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন, কিন্তু তাঁহার সরকারী ভৃত্য তেওয়ারী ঠাকুরের হঠাৎ অন্তর্দ্ধানে সকলেরই মনে কেমন একটা আতঙ্ক ও অশান্তির সঞ্চার হইল। তাহাকে অনেক ডাক হাক করিয়াও কোনখানে সন্ধান পাওয়া গেল না। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবার ডাক্তার বাবুর বন্দুকটীও অন্তর্হিত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্য যে কখনই একক আইসে না তাহা সত্য।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আক্রমণ ও জীবন রক্ষা।

বাঙ্গালার ভিতরের দিকে এক নিভৃত কক্ষায় রমেন্দ্র বাবু স্ত্রী পুত্র সহ শয়ন করিলেন, কিন্তু যশোদা কোনমতেই সেখানে থাকিতে স্বীকৃতা হইল না ও যেখানে সে গৃহস্বামীর মূল্যবান দ্রব্যাদি গোপনে মৃত্তিকাতলে প্রথিত করিয়াছিল সেই ঘরে গিয়া রহিল।

গভীর নিশীথে বহির্দ্বারে উন্মত্ত বিদ্রোহীদলের ভীষণ চীৎকার এবং "হর, হর, জয় শিব, সম্ভু" রবে গৃহস্বামীর শান্তিভঙ্গ হইয়া গেল ও অর্দ্ধ নিদ্রাবস্থা হইতে জাগ্রত হইলে মনের যেমন একটী গোলমালভাব উপস্থিত হয় তাহাদিগের সেইরূপ অবস্থা ঘটিল। রমেন্দ্র নাথ চেষ্টা করিয়াও শিশুপুত্র এবং অশোকাকে একক ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে পারিলেন না ও তাঁহাকে সপরিবারে সেখানে লুকাইত অবস্থায় আবদ্ধ থাকিতে হইল।

এদিকে ক্ষিপ্ত বিদ্রোহীগণ প্রথমে আফিস গৃহের দ্রব্য সামগ্রী লুণ্ঠন করিয়া, তাহার পর ডাক্তার বাবুকে খুঁজিতে খুঁজিতে অন্যান্য ঘরে সবলে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে যাহাই দেখিতে লাগিল তাহাই ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল। এইরূপে ঘোর উন্মাদবৎ বিকট চীৎকার করিতে করিতে যশোদার ঘরের রুদ্ধ কপাট ভগ্ন করিয়া কতকগুলি তাহাতে প্রবেশ করিল ও তাহাকে দেখিয়া

দস্যুদল ভীমরবে "মার মার" শব্দে (হিন্দুস্থানী ভাষায়) মহা গণ্ডগোল করিয়া উঠিল। সেই সিপাইদিগের মধ্যে তেওয়ারী ঠাকুরকে দেখিতে পাইয়া যশোদার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল এবং তখন সে সমুদায় অনিবার্য্য বিপদ ও সহসা তেওয়ারীর পলায়নের কারণ দিব্য বুঝিতে পারিয়া দৃঢ়ভাবে সেইখানে নিরুপায় অবস্থায় বসিয়া রহিল। তেওয়ারীর ইঙ্গিত পাইবামাত্র কয়েকজন ভীষণ-দর্শন সিপাই অগ্রসর হইয়া যশোদাকে ধরিয়া ফেলিল এবং "বাবু কোথায়, বাবু কোথায়, শীঘ্র বল্, শীঘ্র বল্, চাবি দে, চাবি দে, বাবুকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছিস্ বল্ বল্" বলিতে বলিতে প্রহার করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু যশোদা স্থির, গম্ভীরস্বরে বলিল "বাবু দেশে চলিয়া গিয়াছেন, চাবি ইত্যাদি তাঁহার সঙ্গে, আমি জানি না, তাঁহারা এখন কত দূরে, তিনি নাই এখানে, তিনি নাই এখানে, অযথা আমাকে মারিয়া কি হইবে বল? (যশোদাও দিব্য হিন্দী বলিতে পারিত) সিপাইগণ তাহার এই কথায় অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিয়া কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল ও "বাবু কোথায় বল্, শীঘ্র বল্," বলিতে বলিতে ভয়ঙ্কর চীৎকারে গৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। প্রথমে দুই চারিটা আঘাতে যশোদা তেমনি অটল প্রশান্তভাবে অবিচলিত রহিয়া তেওয়ারীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল

"হাঁ ঠাকুর, তোমার এই কাজ, বাবুকে তুমি ধরাইয়া দিতে আসিয়াছ। তিনি যে বাড়ী গিয়াছেন তাকি জান না? বামণের মত এই ব্যবহার তোমার? তুমি "নিমক্ হারাম," বামণ, তাই বাবুকে খুন করিতে সিপাই আনিয়াছ, আমি কি জানি যে বাবুরা

কোথায়। তাঁহারা দেশে গিয়াছেন, এখানে নাই এইত জানি, টাকা কড়ি চাবি সব তাঁহারা লইয়া গিয়াছেন আমাকে মারিলে কি হইবে ?”

তাহার বাক্যে ও দৃঢ়ভাবে সিপাইগণ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়িল ও অবশেষে বিশ্বাসঘাতক তেওয়ারীর পরামর্শে মশালের অগ্নিতে তাহাকে দগ্ধ করিবার ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল তথাপিও যখন যশোদা “বাবু কোথায়” কিছুতেই বলিল না এবং চাবিও দিল না তখন তাহারা তাহাকে রজ্জুদ্বারা কঠিন রূপে বাঁধিয়া গাত্রবস্ত্রে অগ্নি জ্বালাইয়া দিল। যশোদা তৎকালে মৃত্যু যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অসহনীয় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল ও নরাধম তেওয়ারী তাহাতে স্বয়ং তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। এই সময় এমন একটা ভয়াবহ গোলমাল এবং কলরব চারিদিকে উত্থিত হইল ও “পোড়াও পোড়াও, মার মার” শব্দে নৈশ গগন কম্পিত করিয়া তুলিল যে তাহা শ্রবণে রমেন্দ্র নাথ নিতান্ত উদ্বিগ্নভাবে গৃহদ্বার সজোরে উদ্ঘাটিত করিবার প্রয়াস পাইলেন এবং খোকা তাহাতে ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। সেই রোদন লক্ষ্য করিয়া স্বয়ং হাবিলদার অন্যান্য সিপাই সঙ্গে প্রাঙ্গণ হইতে মশাল হস্তে সেইদিকে ছুটিতে লাগিল ও প্রচণ্ড আঘাতে ডাক্তার বাবুর ঘরের কপাট ভাঙ্গিয়া যেই তাহার মধ্যে বেগে প্রবেশ করিতে যাইবে অমনি প্রজ্জ্বলিত মশালে শিশু ক্রোড়ে অপূর্ব্ব ষোড়শী প্রতিমা অশোকাকে দর্শন করিয়া অরণ্যকমল স্তম্ভিত হইয়া গেল ও হস্তের মশাল শিথিলভাবে ভূমিতে খসিয়া পড়িল। তখন সে কিছুই যেন বুঝিতে পারিতেছিল না ও নিরুপমা অশোকা তাহার

বাল্যসখী এবং সমগ্র জীবনের সর্ব্বস্ব রত্ন সেখানে কিরূপে আসিল ও বালিকার রূপরাশি এখন নবযৌবন শোভায় ও সৌন্দর্য্যের কমনীয় উচ্ছ্বাসে উথলিয়া পড়িতেছে, সম্মুখে সেই জীবন্তরূপিনী অশোকা প্রতিমা, দেখিয়া অরণ্যকমলের বিস্ময় ও আত্মবিস্মৃতি ঘটিল এবং নীরবে অনিমিষ লোচনে কেবল তাহাই নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাহার সঙ্গীগণ তাহার এই পরিবর্ত্তনীয় ভাবে অধীর হইয়া চীৎকার আরম্ভ করিল ও গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া রমেন্দ্র বাবুকে ধরিবার জন্য মহা গোল করিতে লাগিল। তাহাদিগের গণ্ডগোলে হাবিলদার অরণ্যকমলের চমক ভাঙ্গিয়া সে তখন কতক প্রকৃতস্থ হইয়া কহিল,

"ভাই সব তোমরা এক পদ নড়িও না, এই ডাক্তার বাবুর স্ত্রী আমার "রাখি" বন্ধনের ধর্ম্ম ভগিনী। তোমরা বীর রাজপুত ও ক্ষত্রিয়, তোমরাত "রাখির" মর্য্যাদা রাখিয়া থাক। তোমরা সব আমার ভাই, আমার বন্ধু, তোমরা আমার জন্য, ধর্ম্মের জন্য ও বীরত্বের জন্য ডাক্তার বাবুকে স্পর্শ করিও না। তাঁহাকে সপরিবারে জীবনদান কর। জীবন দানে মহা পুণ্য। তোমাদিগের প্রভুর ও বন্ধুর আজ্ঞা পালন করিয়া রাজপুতের গৌরব রক্ষা কর। "গুরুজীর" নাম করিয়া ও তাঁহার উপদেশ স্মরণ করিয়া, বিজাতি মার, ম্লেচ্ছ সংহার কর, বর্ত্তমান রাজত্ব উল্টাইয়া দেও। স্বদেশ উদ্ধার করিয়া ধর্ম্মের বিঘ্ন, হিন্দুজাতির শত্রু বধে হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা কর। ডাক্তার বাবুকে মারিলে কি হইবে? আমরা যেমন পরাধীন, পদ দলিত দাস ইঁনিও তেমনি। তোমরা ইঁহাকে দয়া কর। হে! ভাই সব, আমি তোমাদিগের নিকট জীবন ভিক্ষা

চাহিতেছি। আগে আমি তোমাদিগের প্রভু ছিলাম, অদ্য আমি তোমাদিগেরই দাস হইলাম। তোমরা তোমাদিগের বীরের কর্ত্তব্য পালন করিয়া ডাক্তার বাবুকে বাঁচাও, তোমাদের প্রভুর ও অদ্যকার দাসের এ প্রার্থনা রাখ।”

তাহার এই বাক্যে বিদ্রোহীগণ কথঞ্চিৎ স্থির হইল ও অনেকের হস্তস্থিত সঙ্গিণ সহসা মাটিতে পড়িয়া গেল এবং তাহারা হাবিলদারকে অভিবাদন করিয়া এদিক সেদিক ছড়াইয়া পড়িল।

তখন রমেন্দ্র বাবু অশোকাকে অরণ্যকমলের নিকট রাখিয়া যশোদা কি অবস্থায় কোথায় আছে দেখিবার জন্য দ্রুতগতিতে সেইস্থানে যাইলেন এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তিনি যশোদাকে দেখিয়া যেন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া চীৎকার স্বরে অশোকাকে ডাকিলেন। সিপাহিগণ রজ্জুদ্বারা যশোদার হস্ত পদ বাঁধিয়া তাহার গাত্রবস্ত্রে অগ্নি লাগাইয়া দিয়াছে এবং সে অর্দ্ধ দগ্ধ কলেবরে মৃতবৎ ভূমিতলে পড়িয়া যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ করিতেছে। তাহার এই শোচনীয় মৃত্যু যে তাঁহাদিগের নিমিত্ত সংঘটন হইয়াছে তাহা বুঝিয়াই অনুতাপে ও বিষাদে তিনি আরও কাতর হইলেন এবং কোনরূপ ঔষধ দিয়া তাহার মৃত্যু যন্ত্রণা কিছু লাঘব করিতে পারেন কি না তাহার জন্য আফিসের দিকে যাইবার নিমিত্ত দৌড়াইয়া যেমন বাহির হইয়াছেন, অমনি অনতিদূরে হঠাৎ বন্দুকের শব্দ শুনিয়া তিনি চমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং সেই শব্দ শ্রবণ মাত্র সেইখানে অরণ্যকমল ও অশোকা ছুটিয়া আসিল।

বিশ্বাসহন্তা তেওয়ারী প্রাঙ্গণে লুকাইত থাকিয়া রমেন্দ্র বাবুকে

লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িয়াছিল। রমেন্দ্র নাথের অপহৃত বন্দুকে তাঁহাকেই হত্যা করিতে সে গোপনে একক দল ছাড়িয়া লুকাইয়া ছিল ও পাপ বাসনায় অকৃতকার্য্য হইয়া ভগ্ন মনে অদৃশ্যে পলায়ন করে। সেই দিন হইতে তাহাকে আর কেহ দেখিতে পায় নাই।

অশোকা মাতৃসমা বিশ্বস্ত অভিভাবিকার এই প্রকার অভাবনীয় হৃদয় বিদারক অবস্থায় ও মৃত্যুশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িল ও নবীভূত পিতৃ মাতৃ শোক আবার পাইয়া জীবনের আশা ভরসা সুখ যেন চিরকালের মত হারাইল।

যশোদা প্রভুর অর্থাদি ও জীবন রক্ষার্থে আত্ম প্রাণ বলিদান দিয়া স্বর্গারোহণ করিল। (মুক্তির দ্বার তাহার নিমিত্ত চির উদ্ঘাটিত রহিল)। সেখানে তাহার আসন উচ্চ ও অবিনশ্বর। সে পুণ্যরাজ্যে সাধুর পবিত্র আত্মা নিত্য পূজনীয়, ও ভগবানের নিকট তাহার আদর উচ্চতর কার্য্যে হয়। জাতিগত বর্ণ বৈষম্যে সে স্থান কলঙ্কিত নহে। যশোদার পুণ্যাত্মা সেই পুণ্যধামে শান্তি-সুখে বিশ্রাম লাভ করিল। সে সুখের সহিত তুলনায় পার্থিব সুখ অতি অকিঞ্চিৎকর ও অস্থায়ী। পরলোক না থাকিলে ইহলোকের জীবন শান্তিশূন্য ও ধূমময়। পরকাল বিশ্বাস না করিলে পদে পদে বিড়ম্বনা। ভগবান ভক্ত সাধুজন সেই লোক চিন্তায় এ লোকের শত শোক দুঃখের অন্ধকারে শান্তির পবিত্র আলোক দর্শন করিয়া থাকেন। যশোদাও সেইখানে পুণ্যের পুরস্কার লাভে অমরতা প্রাপ্ত হইল।

অরণ্যকমলের সাহায্যে সেই রাত্রেই রমেন্দ্র নাথ স্ত্রী পুত্র সহকারে লক্ষ্ণৌ নগরী পরিত্যাগ করিয়া যান। পথে পুনর্ব্বার

বিদ্রোহী হস্তে বিপদগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা থাকায় অরণ্যকমল গোপনে রক্ষক স্বরূপ তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল। পথে আরও দুই একবার তাঁহারা সিপাইদিগের হস্তে পড়িয়া অরণ্যকমলের "রাখি" ভ্রাতৃত্বে রক্ষা পান। সে সকল ক্ষুদ্র ঘটনা, বিশেষ করিয়া উল্লেখ যোগ্য নহে।

পরিশিষ্ট।

সিপাই বিপ্লবের মহা অগ্নি বৃটিশসিংহের দুর্জ্জয় প্রতাপে অচিরাৎ নির্ব্বাপিত হইলে বিদ্রোহী সিপাইদিগকে ধৃত করিতে চতুর্দ্দিকে আর এক বিদ্রোহী উপস্থিত হইল। পশ্চিমের যেখানে যাহাকে একটু ভীত, একটু সন্দিগ্ধ অবস্থায় পাইতে লাগিল, তাহাকেই রাজ পুরুষেরা বিদ্রোহী স্থির করিয়া সরাসরি (Summary) বিচারে চরমদণ্ড বিধান করিতে লাগিলেন। রোগের অপেক্ষা ঔষধ গুরুতর হইয়া উঠিল।

জীবারাম গোস্বামী মিরাট হইতে কানপুর পর্য্যন্ত সিপাই-দিগের গুরু স্বরূপ,—দলপতি রূপে গোপনে থাকিয়া তাহাদিগকে ইংরাজের প্রতিকূলে যে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, এ সংবাদ ইংরাজের কর্ণগোচর হইবামাত্র তখন তাঁহাকে ধৃত করিতে "গ্রেপ্তারি পরোয়ানা" বাহির করা হইল, কিন্তু জীবারাম ঠাকুর সন্ন্যাসী, কখন বৃক্ষতলে, কখন যমুনা ঘাটে, কখন আবার হিন্দু দেবমন্দিরে থাকিতেন সুতরাং তাঁহার বাসস্থানের স্থিরতা না থাকায় কেহই তাঁহার সন্ধান করিতে পারিল না। তিনি ছদ্ম-বেশে রজনীযোগে কানপুর হইতে পলায়ন করিয়া মথুরায় শঙ্করানন্দ স্বামীর আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

অরণ্যকমল তাঁহার উপদেশে এবং উচ্চ কর্ম্মচারীর অযথা অপমানে ক্রোধ বশতঃ বিদ্রোহী দলভুক্ত হইয়াছিল। তাহার 'পর অগত্যা সেও গোস্বামী ঠাকুরের পদানুসরণ করিয়া তাঁহারা উভয়ে সেখান হইতে লুক্কায়িতভাবে নেপালে প্রস্থান করেন।

সেই হইতে তাঁহাদিগের আর কোন নিশ্চয় সমাচার পাওয়া যায় না।

অশোকা শ্বশুরালয়ে সাদরে গৃহীত হইয়া পতিপ্রেমে ও অন্যান্য সাংসারিক সুখে সৌভাগ্যবতী থাকিয়াও যশোদার জীবনের শোকাবহ অন্তিমদৃশ্য এবং শৈশব বন্ধু অরণ্যকমলের স্নেহানুরাগও "রাখি" ধর্ম্মের নিঃস্বার্থ উপকার এক দিনের জন্যও ভুলিতে পারে নাই।

অকৃত্রিম সরল ভালবাসা মনুষ্য জীবনের সর্ব্বস্ব এবং তাহা যিনি একদিনও ইহসংসারে পাইয়াছেন তিনি যথার্থ সুখী ও পুণ্যবান্।

সমাপ্ত।

সমালোচনা।

আর্য্যাবর্ত্ত।—প্রথম ভাগ। শ্রীমতী "বনলতা ও নীহারিকা" রচয়িত্রী কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য আট আনা। গ্রন্থকর্ত্রী "নীহারিকা ও বনলতা" প্রণয়ণ করিয়া ইতি পূর্ব্বেই সাহিত্য জগতে যশস্বিনী হইয়াছেন, আমরা নীহারিকার সমালোচনা কালে তাঁহার ভূয়ো-ভূয় প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, নারীর রচিত বলিযা দয়াব সহিত তাঁহার গ্রন্থেব আমরা সমালোচনা করি নাই। গ্রন্থকর্ত্রীব শরীর ভঙ্গ হইয়াছে, তাই দুঃখ হয় তাঁহার হৃদয় হইতে আব বন-ফুলেব সুবাস বাহির হইবে না, সুকোমল দুর্ব্বাদলে আর প্রাতঃ নীহার দেখিয়া হৃদয় তৃপ্ত হইবে না। কিন্তু ইনি স্বাস্থ্য লাভের জন্য আর্য্যাবর্ত্ত ভ্রমণ করিয়া কেবল দেখিয়াই তৃপ্ত থাকিতে পাবেন নাই, স্বয়ং আর্য্যাবর্ত্তের রমণীয় সৌন্দর্য্য উপভোগ কবিযাছেন, আবার তাঁহার স্বাভাবিক ভাষার লালিত্যে পাঠকদিগকেও সেই সৌন্দর্য্য উপভোগে অধিকারী করিয়াছেন। এই গ্রন্থে ইটোযা, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন দিল্লী প্রভৃতি স্থানের বিস্ময়কর কৃত্রিম ও স্বাভাবিক পদার্থ সমূহের উজ্জ্বল বর্ণনা আছে। তাহা পাঠ করিতে করিতে মনে হয় চক্ষের সম্মুখে বর্ণনীয় বিষয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের এক এক স্থান পড়িয়া শরীব রোমাঞ্চিত হয়। ইন্দ্রপ্রস্থ দর্শন করিয়া গ্রন্থকর্ত্রী লিখিয়াছেন :—

"ধন, মান, সুখ, সম্পদ, বীরত্ব ও পুণ্যময় স্বাধীনতার একত্রীভূত সমষ্টি, স্মৃতির পরম আদরণীয় ও কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ এই ইন্দ্রপ্রস্থ। ভীমার্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের পবিত্র পদরেণু অদ্যাপি ইহার—অণুতে, প্রত্যেক ধূলিকণা যেন তাঁহাদিগের জীবনকাব্যের পবিত্রতার মধুর কাহিনীর পরিচয় দিতেছে। যুগ যুগান্তরবাহী সমীরণ আজিও যেন ভারতের দ্বারে দ্বারে সেই পূর্ব্বের অতুলনীয় মহিমা-গীতি গাইয়া বেড়াইতেছে,—দুর্ভাগ্য, দাসত্বজীবি মৃতপ্রায় আর্য্য সন্তানের পুনর্জ্জীবন দান করাই যেন তাহার অভিপ্রায়। অতীতের সে সঞ্জীবনী সুধা গীতে যদি আবার ভারতে নবজীবন সঞ্চার হয়, আবার যদি তাহাতে নিদ্রিত ভারতবর্ষ উৎসাহানলে জ্বলিয়া উঠে, তবেই চির বিশ্বস্ত বায়ু কৃতার্থ হইবে।

ইন্দ্রপ্রস্থ এবং দিল্লী দুইটি বিভিন্ন নগরী ও অতি সামান্য পথমাত্র ব্যবধান। পরবর্ত্তী আর্য্য পুত্রগণ পূজনীয় ইন্দ্রপ্রস্থের শেষ রেখাও যে আর দেখিয়া জীবন সার্থক করিবেন, সে আশা বড় কম। ভারতের মানচিত্রে তাহার প্রতিকৃতি বহুদিন লোপ পাইয়াছে, কেবল স্মৃতিযোগে ভগ্ন প্রস্তরে ইন্দ্রপ্রস্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

"যুগান্তরের সাক্ষী-রূপী এই যে অযুত অযুত রাজপুত বীরের লীলাক্ষেত্র দিল্লীনগরী—এই শরীরী স্বপ্নময় কীর্ত্তির মহা শ্মশানে দাঁড়াইয়া অদ্য যদি আমি অভ্রভেদী স্বরে ক্রন্দন করি, তবে আমার সে মর্ম্মান্তিক করুণ রোদন ধ্বনি কাহার প্রাণ স্পর্শ করিবে? কে আমার হৃদয়ের গভীর বেদনা বুঝিবে বল?

"ভারতে জীবন নাই, শব রাশি রাশি জাহ্নবীর দুই তীরে।"

চারিদিকে ভগ্নাবশেষ। সর্ব্বত্র শ্মশান, ধু ধু করিয়া চিতানল

জ্বলিতেছে, তাহাতে আশা ভরসা, উৎসাহ, উদ্যম অনুদিন পুড়িয়া পুড়িয়া সব ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে। মনে হয়, কুরুক্ষেত্র মহা সমরে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, আজও যেন সেই জাতিবিরোধ-রূপ সর্ব্বগ্রাসানল নির্ব্বাপিত হয় নাই। জীবনের পার্থিব মায়া পরিহার করিয়া "সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং, শস্য শ্যামলাং" পবিত্র মাতৃভূমিকে প্রাণ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা না করিলে অদ্যকার এ দুর্গতি আর ঘুচিবার নয়।

> "ছিল বটে আগে তপস্যার ফলে।
> কার্য্য সিদ্ধ হতো এ মহীমণ্ডলে॥
> এখন সে দিন নাহিক রে আর।
> দেব আরাধনে ভারত-উদ্ধার—
> হবে না হবে না"

ইহাই পরীক্ষিত সত্যস্বরূপ মনে বিশ্বাস করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধারে বদ্ধ পরিকর হইতে হইবে।

এখনও "বিংশতি কোটি" ভারত সন্তান এক মনে, এক প্রাণে সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সাধনা করিলে অবশ্যই সিদ্ধ-মনোরথ হইতে পারেন।"

যে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল তাহা দেখিয়াই যদি কেহ এই গ্রন্থের গুণের বিচার করেন তবে ঠকিবেন। এই গ্রন্থে অনেক সুন্দর বর্ণনা, অনেক গভীর জ্ঞানীর মন্তব্য আছে।

রচয়িত্রী পতিত ভারতের ভূতগৌরব কাহিনী তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যাকে উপহার দিয়াছেন।

কন্যাকে বলিতেছেন "তবে অন্য কথা শুন, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, দ্রৌপদী ও লক্ষ্মীরাণী প্রভৃতি পুণ্যবতী প্রাতঃস্মরণীয়া আর্য্যনারীগণ যে দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন সেই দেশে তুমিও জন্মিয়াছ, এইটী সতত স্মরণ রাখিয়া তাঁহাদিগের উচ্চতম আদর্শে এবং তাঁহাদেরই পদানুসরণে অদ্যকার বিজাতিসভ্যতা-বিড়ম্বিত না হইয়া যথার্থ হিন্দু মহিলার উপকরণে নিজের সুকুমার হৃদয় ও কিশোর চরিত্র সুগঠিত কর। তাহা হইলেই তোমার জননীর অবিরামবাহী নীরব স্নেহের কতক প্রতিদান হয়।"

হাঁ, এই রূপেই বঙ্গনারীর জীবন গঠিত হউক।

সন ১২৯৫, ৭ই মাঘ, সঞ্জীবনী।

ARYAVARTTA.*

OF regular books on travelling we have very few to boast of in the Bengali language, and of such works by Bengali ladies, we have still fewer, if any excluding stray contributions to the periodical Press. It is, therefore, with the utmost pleasure, that we hail the publication, with, which, under the above heading, the accomplished authoress of "Banalata" and "Neharika," has brought out as a record of her travels in the North-Western Provinces in India. The account given of the places she visited, and the sights she saw are, perhaps, not so exhaustive as she

could be wished for, but the style in which she has put them, and the patriotic sentiments they teem with, have added considerably to the attractions of the publication, and go unmistakably to prove that she is as much at home in prose, as she has already shown herself to be in verse. The half bantering and the fully poetical manner in which she dealt with her subject has thrown an irresistible charm over the production which ranks high in the range of the travelling literature of Bengal. We have no doubt that the account of her travels will have as beneficial an effect in the minds of her readers, as, we hope, the change of air has done to her physical constitution.

**Aryavartta*. The travels of a Bengali Lady. Part I. By the authoress of the "Banalata" and "Nitharika." Calcutta: Printed and published by Kalidas Chukerbutty, at the Adi Brahmo Somaj Press, 55, Upper Chitpore Road.

"THE INDIAN MIRROR"
17th April, 1889.

"আর্য্যাবর্ত্ত, বনলতা ও নীহারিকা—

রচয়িত্রী কর্ত্তৃক প্রণীত।

বঙ্গ মহিলার ভ্রমণ বৃত্তান্ত, বোধ হয়, ইহার পূর্ব্বে আর কখন ক্লাশিত হয় নাই। যে কয়েক খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে,

সকল গুলিই পুরুষের লেখা, পুরুষ লেখকগণের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ভাষা ও বর্ণনার তুলনায় শ্রীমতী "নীহারিকার" গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট হইয়াছে বোধ হয় না। যাঁহারা দিল্লী ও আগ্রার ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন, ভাস্করাচার্য্যগণের মহিমা কবির শিল্পনৈপুণ্যের নিকট পরাস্ত হইয়াছে। এই পুস্তকের কিয়দংশ আমাদের "নব্য ভারতে" প্রকাশিত হইয়াছিল। অগত্যা এ গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনে আমরা পরাঙ্মুখ হইলাম।"

"নব্য ভারত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়"

১৫ই আষাঢ়, ১২৯৬।